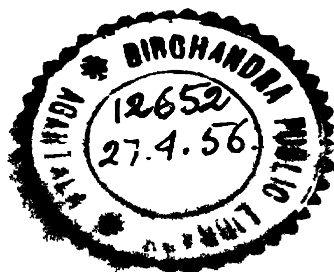
বাঙালীর জীবন-সন্ধ্যা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী



মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

—দু টাকা বারো আনা—



মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
ি প্রিন্টিং হাউস, ৭০, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গুহ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

করকমলে

ভূমিকা

গ্রন্থোক্ত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষ্যে লিখিত। সবগুলিই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙালী সমাজের বর্তমান দুর্গতির কারণ ও স্বরূপ ইহাদের আলোচ্য বিষয়। বাঙালী পাঠকের এগুলি মুখরোচক না লাগিবারই কথা। মুখরোচক এবং ঔষধ একাধারে এমন বস্তু অতিশয় বিরল।

'বন্দে ভারতম্' প্রবন্ধে 'বাংলাদেশের বর্তমান শাসকমণ্ডলী'র উল্লেখ আছে—ঐ নামে অখণ্ড বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলীকে বুঝিতে হইবে।

'শিল্পের মুক্তি' প্রবন্ধ জামসেদপুর চলন্তিকা সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ।

সূচী

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ভারতবর্ষের আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের গৌরব তৎকালীন বাঙালী মনীষিগণ করিতে পারেন। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে এই আবিষ্কার উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত। আমেরিকা বলিতে একটি সুবৃহৎ ভূখণ্ড বোঝায়, কোন নূতন তত্ত্বকে বোঝায় না। আমেরিকা বৃহত্তর ইউরোপ—তাহার অধিক কিছু নয়। ইউরোপীয় জীবনতত্ত্ব আর আমেরিকীয় জীবনতত্ত্বে কোন প্রভেদ নাই—একটি আর একটির প্রক্ষেপ মাত্র। ইউরোপীয় জাতি ও সভ্যতাই আমেরিকার বিস্তৃততর ক্ষেত্রে গিয়া হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়াছে—এই যা প্রভেদ।

ভারতবর্ষ বলিতে একটি ভূখণ্ড বুঝি, আবার ভারতবর্ষ বলিতে বিশেষ একটি জীবন-দৃষ্টি বুঝি। ভারতবর্ষের আবিষ্কার বলিতে বুঝি এই জীবন-দৃষ্টির উদ্ধার। ইহা জাগতিক সত্য নয়, আন্তরিক বা তত্ত্বগত ব্যাপার। রেনেসাঁসের প্রেরণায় ইউরোপ বস্তুজগতের অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, বাহ্যজগতে অভিযান চালাইতে হইলে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আবশ্যক, ইউরোপের তাহার অভাব ছিল না, সেইজন্যই রেনেসাঁস-পরবর্তী ইউরোপের দৃষ্টি জাগতিক সত্যের উদ্ধারে যেমন পড়িয়াছিল, আন্তরিক সত্যের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো-ডি-গামার নৌপথে ভারতে আগমন, কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের ড্রেক ও কুকের পৃথ্বী-পরিক্রমা আর গ্যালিলিওর দূরবীণ সাহায্যে জ্যোতির্লোকে অভিযান, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার সমস্তই বস্তুত একই পর্যায়ভুক্ত। সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টিটা বহির্বিশ্বের রহস্যোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত।

উনবিংশ শতকের প্রথমে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে

এদেশে যখন রেনেসাঁসের বিলম্বিত ঢেউ আসিয়া আঘাত করিল, তখন সদ্য-জাগ্রত ভারতীয় চিত্তেও একটা আভিযানিক ব্যাকুলতা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থাভেদে তাহার ফল ভিন্ন হইল। যদিচ বঙ্কিমচন্দ্র আশা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ-সাহচর্য ভারতীয়-চিত্তকে লোকশিক্ষা, লোক-ব্যবহার ও জাগতিক সত্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে—কিন্তু তাঁহার সে আশা তেমনভাবে সফল হয় নাই। তার কারণ বহির্বিশ্বের দ্বার ভারতবর্ষের সম্মুখে অবারিত ছিল না—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না; বরঞ্চ ইহাই নিদারুণতর সত্য যে, ভারতবর্ষ পূর্বতন রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইল। বহির্জগৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল না বলিয়াই তাহার নবজাগ্রত চৈতন্য অন্তর্মুখী হইয়া গেল—অন্তর্মুখে যাত্রা করিয়া সে ভারততত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বসিল।

রেনেসাঁস-ধর্মের দ্বারা উন্মেষিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকিলে খুব সম্ভব সে-ও অন্যান্য জাতির মতোই বাহিরের অভিযানে যাত্রা করিয়া বসিত, খুব সম্ভব তাহার নাবিকগণ ভারত মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিত, খুব সম্ভব তাহারা মেরুর তুষার-স্তূপের উপরে আপন পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিত। কিন্তু এসব কিছুই ঘটিল না। এমন হওয়া যে অসম্ভব ছিল না, তার প্রমাণ—আরও পরবর্তী কালে জাপান এই পথেই চলিয়াছিল। স্বাধীনতা হারাইবার পূর্বেই জাগ্রত জাপান সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। রেনেসাঁসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃতিকেই সে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল—তাহারই প্রয়োগে সে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল—জাপানের দৃষ্টি অন্তর্লোকে পড়িবার সুযোগ পায় নাই।

ভারতবর্ষ বলিতে একটি বিশেষ জীবনতত্ত্ব বা জীবন-দৃষ্টিকে বুঝায়—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই তত্ত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং পুরাণে, দর্শনে এবং কাব্যে, তাহার অট্টালিকায়, সৌধে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, চিত্রে এবং মন্দিরমালায় এবং সবচেয়ে জীবন্তভাবে তাহার মহাপুরুষগণের জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া বিরাজ করিতেছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের অনস্তিত্ব ঘটিয়াছিল। অশোকের

শিলালিপি অক্ষরপরিচয়-বিস্মৃতি-বশে যেমন থাকিয়াও ছিল না—ভারত-তত্ত্বেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। রামমোহন-প্রমুখ মনীষিগণ সেই বিস্মৃত সত্যের পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহা সৃষ্টি নহে, আবিষ্কার মাত্র, একথা বলিয়া ইহার গৌরব লঘু করিয়া দেওয়া চলে না। আমেরিকাও তো কলম্বাসের সৃষ্টি নহে। তবে বিস্মৃত বা গুপ্ত সত্যের আবিষ্কার প্রায় সৃষ্টিরই সামিল। আবিষ্কারক সঙ্কীর্ণ স্রষ্টা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ শাসনের প্রথম ও প্রবল ঢেউটা বাঙলাদেশে আসিয়া লাগিয়াছিল। তাহার সুফল ও কুফল দুই-ই আমরা পাইয়াছি। সুফলের মধ্যে ভারত আবিষ্কার, কুফল এখন ভোগ করিতেছি; কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলাদেশে আসিয়া সবচেয়ে কায়েম হইয়া বসিলেও তাহার লুব্ধ দৃষ্টি গোটা ভারতবর্ষের প্রতি প্রসারিত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী ও কমিসারিয়েটের চাকুরেগণ (ইন্দিরার স্বামী এবং গোরার তথাকথিত পিতার দল) কোম্পানীর তল্পি বহিয়া ভারতবর্ষে বাহির হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতা কর্মময় ভারতের নাভিকেন্দ্রে পরিণত হইল। বহির্ব্যাপারে ভারতবর্ষ যে এক, এই ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট নীহারিকার আকারে তখন দেখা দিতে লাগিল। বস্তুগত এই ঐক্যটাই মনীষিগণের চিত্তে নূতন আকার ও অর্থ লাভ করিল। বাঙালী মনীষিগণ ভারত-চৈতন্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেন। প্রথম জাগিলেন রামমোহন। তাঁহার বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠার মূলে ভারত-চৈতন্য নিহিত। আবার তিনি ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রাদেশিকবোধের অনেক উচ্চতর স্তরের মানুষ। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতবাসী অখণ্ডত্ব বোধ করিতে শিখিবে; তিনি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, যুগধর্মোচিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই ভারতবাসীকে বিশ্বচিত্তের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে। অক্ষয় দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক

সম্প্রদায়ের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন; এদেশের নারীসমাজের দুর্গতি স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষকে সম্বোধন করিয়া বিদ্যাসাগর খেদ করিয়াছেন; ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছিলেন যে, কেবল হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন সমাজ ঐক্যবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইতে পারিবে; হিন্দুসভা, ভারত-সভা ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—সমস্তই ভারত-চৈতন্যের চিহ্ন; সেকালে একা হেমচন্দ্র ভারতসঙ্গীত লেখেন নাই—ওইটাই সাধারণ নিয়ম ছিল—ভারতবর্ষকে স্মরণ করিয়াই সকলে শোক ও আনন্দ প্রকাশ করিত। বিবেকানন্দের ভারতভ্রমণ ভারতবর্ষকে নিবিড়তর ভাবে উপলব্ধির চেষ্টা। সবশেষে আসিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি ভারততত্ত্বকে অমরবাণীময় রূপ দান করিয়াছেন। সেকালের বাঙালী মনীষিগণ মূলত ভারতীয় ছিলেন, বাঙালীয়ানা তাঁহাদের মুখোষ মাত্র। আর একালের ভারতীয় মনীষিগণের মুখোষ খুলিয়া ফেলিবামাত্র প্রাদেশিক সত্তা বাহির হইয়া পড়ে। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী মনীষিগণ ভারততত্ত্বকে আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।*

ভারতবর্ষ বা ভারততত্ত্ব বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য। বস্তুত ভারতবর্ষ বলিতে যে-সব আইডিয়ার সমষ্টিকে এখন আমরা বুঝি, বহুলাংশে তাহা রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবনা। তাঁহার অমর বাণী এই ভাবমূর্তিকে ভাষা-পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াছে। ভারতবর্ষ বলিতে যে ধ্যানমগ্ন তাপসমূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার চক্ষে দেখিতে পান—একবার তাহাকে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পান—"ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত

* মহাত্মাজী কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে ও দূরবর্তী ক্ষেত্রে থাকিয়া একই সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে একই পরিণামে ও মহত্তর সার্থকতায় উপনীত হইয়াছেন। বাঙালী মনীষিগণের হাতে যাহা ভাবরূপ মাত্র ছিল, গান্ধীজীর হাতে তাহা কর্মরূপ পাইয়াছে।

হইতেছে, যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে।"

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ সন্ন্যাসী। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, সন্ন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের চরমরূপ মনে করিতেন বা ভারতবর্ষ সন্ন্যাস-সাধনা ব্যতীত আর কিছু করে নাই। সন্ন্যাসীর মধ্যে যে নির্বিকার নিরাসক্তি আছে, ভারতবর্ষ তাহাকেই জীবনধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সাধনা নিরাসক্তি যোগ। যথার্থ নিরাসক্তি ব্যতীত কোন মহৎ কায সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিই তো নিরাসক্তের দৃষ্টি। ব্যবসা-বাণিজ্যও কি অন্যকর্ম-নিরাসক্ত না হইলে সম্ভব? ভারতবর্ষ এই নিরাসক্তি যোগকে তাহার লক্ষ্যের চরম পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে একেবারে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। নিরাসক্তিকে সে জীবনের পরম নির্ভর করিয়াছিল বলিয়াই ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভালো-মন্দ খণ্ড-পূর্ণ সমস্ত প্রকার বিরোধের মধ্যে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার কাজে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের সাধনা সমন্বয়ের সাধনা—আর এই সাধনার পক্ষে নিরাসক্তি অত্যাবশ্যক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান সার্থকতা কি, এই প্রশ্নের উত্তরদান উপলক্ষ্যে কবি বলিতেছেন,—"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা

সম্ভব।···পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান ইউরোপের সাধনা unity, আর ভারতবর্ষের সাধনার বিষয় harmony। ইউরোপ বহুকে পিণ্ডীকৃত করিয়া এক করিয়া ভাবে এক হইল—unity স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষ বিচিত্রকে স্বীকার করিয়া, তাহাদের প্রকৃতিভেদকে মানিয়া লইয়া স্বতন্ত্র করিয়াই রাখে—কিন্তু সমস্ত স্বাতন্ত্র্যকে একটি মহৎ ভাবের মধ্যে গ্রথিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে—ইহাই harmony। ইউরোপীয় জাতিসমূহ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কেপ কলোনি, আমেরিকা, প্রভৃতি যে-সব অশ্বেতকায়গণের দেশে গিয়াছে—সেখানকার অশ্বেত সমাজ উৎসাদিত হইয়াছে—তাহার কারণ আর কিছুই নয়—পরকে কি করিয়া আপন করিতে হয়, শ্বেত ও অশ্বেতের মধ্যে কিভাবে harmony স্থাপন করিতে হয়—সে রহস্য ইউরোপীয়গণের অজ্ঞাত। কিন্তু ভারতবর্ষের পন্থা ভিন্ন।

"পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে-প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।··· ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।"

এই harmony স্থাপনকে ভারতবর্ষ কেবল সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে মাত্র প্রয়োগ করে নাই,—ধর্মনীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিযাছে। গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে এই harmony স্থাপনের প্রয়াসকেই দেখি—আর খুব সম্ভব এই কারণেই গীতা ভারতবাসীর ধর্মজীবনের পক্ষে ধ্রুব নক্ষত্রবৎ হইয়া বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সমন্বয়বাদ পৃথিবীর সমক্ষে একটি মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি বলেন—"পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা, নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

মূলত ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ বা ভারত-তত্ত্ব, এবং মূলত ভারতবর্ষের এই রূপটি উনবিংশ শতকের রামমোহন-প্রমুখ মনীষীর আবিষ্কার। তাঁহারা হয়তো কেহই রবীন্দ্রনাথের মতো অমরবাণীতে ইহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকাশকে দেখিলে বলিয়া উঠিতেন—ইহাই আমাদের সাধ্য, ইহাই আমরা বলিতে চাহিতেছিলাম।

এখন এই ভারতবর্ষের, সমন্বয় যাহার ধর্ম, পৃথিবীর পক্ষে আজ একান্ত প্রয়োজন। যানবাহন রেল-রেডিও টেলিগ্রাফ-বিমানের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সংস্কার ও স্বার্থ লইয়া একে অন্যের ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্ঘর্ষের আর অন্ত নাই। এই সঙ্ঘর্ষ নিবারণের দুইটি উপায় আছে—এক উপায় ইউরোপীয় পন্থায় unity প্রতিষ্ঠা, আর এক উপায় ভারতীয় উপায়ে harmony প্রতিষ্ঠা। Unity স্থাপনের এক প্রকার চেষ্টা বৃটেনের দ্বারা হইয়াছে—সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, আর এক প্রকার চেষ্টা চলিতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বারা, বিভিন্ন জাতির গলায় অর্থনৈতিক ফাঁস আটকাইয়া দিয়া। পন্থায় কিছু ইতর-বিশেষ থাকিতে পারে—কিন্তু পরিণাম একই। যাহা ঘটে তাহাকে unity না বলিয়া পিণ্ডীকরণ বলা

উচিত। এই প্রকার চেষ্টায় 'বহু' এক হইতে পারে—কিন্তু গায়ের জোরে বিচিত্রকে এক করিয়া ফেলা তো লক্ষ্য নয়, বিধাতার সেরূপ অভিপ্রায় হইলে তিনি বিচিত্রের সৃষ্টি না করিয়া একেরই বহুগুণিত রূপ সৃষ্টি করিতেন। বহুর মধ্যে মিলন সাধনই সভ্যতার লক্ষ্য—বহুকে পিষিয়া এক করিয়া ফেলা কদাচ তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। এই মিলনসাধনেরই নাম harmony —ইহা ভারতবর্ষের স্বভাবসঙ্গত, ইহাই তাহার ধর্ম। সেই কারণেই আজকার সঙ্ঘর্ষপ্রবণ বিশ্বে ভারতবর্ষের একটি মহৎ মিশন আছে। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্ট ভারততপস্বী গান্ধীমূর্তিতে নূতন পাত্রে পুরাণী সুধা বহন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বিধাতা ব্যাধি দিয়াছেন, আবার সেই সঙ্গে অমৃতেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিশ্বের পক্ষে ভারততত্ত্ব আজ অপরিহার্যভাবে আবশ্যক। তাই বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষের আবিষ্কার আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে মহত্তর সম্ভাবনার স্থল।

২

পূর্বাংশে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কৃতি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ। প্রায় শতবর্ষকাল ধরিয়া বাঙালী মনীষিগণ কিভাবে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন তাহার আলোচনা হইয়াছে। বহির্জগতে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তাহার উত্তরাধিকারী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একটা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুরূপ একটা প্রক্রিয়া চলিতেছিল অন্তর্লোকে। বৃটিশ শাসক ও বাঙালী মনীষিগণ পরস্পরের পরিপূরকভাবে কাজ করিতেছিলেন।

এসব কথা এখন প্রাচীন ইতিহাসের না হইলেও পুরাতন অধ্যায়ের বিষয়, কারণ ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসন পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙা টুকরাগুলি সাজাইয়া একটা অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবী বৃটেন করিয়া থাকে, করিতে পারে। অন্তত বস্তুটা যে দৃশ্যত সত্য সে

বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ সেই বস্তু ছাড়িয়া বৃটেন অপসৃত। এখন আমাদের হাতে আসিয়া ইহার কি পরিণাম হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। দুইটি সম্ভাবনা আছে। বৈদেশিক শাসকের বাহ্য চাপে যে অখণ্ডতা গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের আন্তরিক আগ্রহের স্পর্শে তাহা দৃঢ়তালাভ করিতে পারে। ইংরেজ ইঁটের পাঁজা মাত্র গড়িয়া দিয়াছে—একটা ইঁটের সহিত অপর ইষ্টক-খণ্ডের অনিবার্য যোগস্থাপন করিতে পারে নাই, তবুও তাহার স্তূপীকৃত অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের হাতে পড়িয়া ইঁটের সহিত ইঁট আন্তরিকতার মশলায় গ্রথিত হইয়া সুখদুঃখের বাসযোগ্য সুদৃঢ় অট্টালিকায় পরিণত হইতে পারে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, আমাদের সঙ্কীর্ণ দর্শনের ফলে পাঁজার ইঁটগুলি আবার মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়া ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অষ্টাদশ শতকের পুরাতন পালার পুনরভিনয় ঘটাইতে পারে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস এ দুয়ের কোন্ পথ অবলম্বন করিবে কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। এ যেমন গেল বাহিরের অখণ্ডতা, তেমনি ভিতরের অখণ্ডতা, যাহাকে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের চিন্ময় রূপ বলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধেও চিন্তার সময় আসিয়াছে। বস্তুত বাহ্যরূপ ও আন্তরস্বরূপ দুটিই এক সূত্রে গ্রথিত কিংবা একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। একটিতে ভাঙন ধরিলে অপরটির ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। বাঁচিলে দুটিই একসঙ্গে বাঁচিবে, নতুবা দুটিরই একসঙ্গে বিনষ্টি। দেশের সম্মিলিত মনীষা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার চরম পরীক্ষার ফলস্বরূপ সুফল বা কুফল সকলে ভোগ করিবে। সেই পরীক্ষার কাল আসন্ন। আর দেশের ভাবগতিকে আশঙ্কা হইতেছে, দুরদৃষ্টের প্রেরণায় আমরা একটা অবাঞ্ছনীয় পরিণামের মুখে ক্রমবর্ধিত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছি।

৩

এবারে ভারতবর্ষের ভূগোলের ও ইতিহাসের কয়েকটি স্থূল তথ্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। সমুদ্র এবং পর্বতমালার

দ্বারা পরিবেষ্টিত সুনির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড ভারতবর্ষ—একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ইহার পরিপূরক তথ্যটা সম্বন্ধে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। সমুদ্র এবং পর্বত যেমন এদেশের কাঠামোটাকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তেমনি দেশাভ্যন্তরে গিরিমালা ও নদীপ্রবাহ ইহাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বিন্ধ্য গিরিমালা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের ভূগোল ও ইতিহাস স্বতন্ত্র। সিন্ধুনদ ও তাহার আনুষঙ্গিক নদীগুলি পাঞ্জাবকে একটি বিশেষ নদীময় উপত্যকায় পরিণত করিয়াছে। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী স্থান গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকা প্রদেশকে একটি বিশিষ্ট অংশ বলা যায়। আর সর্বশেষে রহিয়াছে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার (বস্তুত গঙ্গার) পলিপ্রবাহে সৃষ্ট নদীমাতৃক বঙ্গদেশ অঞ্চল। মোটের উপরে ভারতবর্ষের এই চারটিই প্রধান স্বতন্ত্র অংশ। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক অংশকে আবার নদীপ্রবাহের খেয়াল অনুসারে, যেখানে পাহাড় আছে তাহার অবস্থান অনুসারে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত বলিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই—ইহাতেই আমাদের কাজ চলিবে। এই ভাগ প্রকৃতিকৃত ভাগ, মানুষের হাত নাই। বরঞ্চ বলা চলে যে, প্রকৃতিকৃত এই ভাগের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই মানুষ তাহার ইতিহাস রচনা করিয়া তুলিয়াছে। ভূগোলের ক্ষেত্রে দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ সত্য ভারতবর্ষে সন্নিহিত। একটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিশেষভাবে পৃথগীকৃত একটি ভূখণ্ড ভারতবর্ষ। দ্বিতীয়টি, এই সুবৃহৎ দেশটিও আবার নদী ও গিরিমালার খেয়ালে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত।

এখন এই দুইটি ভৌগোলিক সত্যের প্রেরণায় এদেশের ইতিহাসও যেন দ্বৈতগতি, যেন পরস্পর-বিরুদ্ধ গতি লাভ করিয়াছে। পৌরাণিককাল হইতে এদেশের সমুদয় অংশকে সংহত, সংযুক্ত করিয়া 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যেমন চলিয়া আসিতেছে, তেমনি আবার সেই প্রয়াস দুর্বল হইয়া পড়িবার

সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া যাইবার প্রেরণাও দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য তাহার এই দ্বৈতগতি, একদিকে অখণ্ডতা সৃষ্টি, অপরদিকে ভঙ্গ-প্রবণতা। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানাটানির ফলাফল—ভারতবর্ষের ইতিহাস।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের বলিয়া দেয় যে, অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই এদেশের শক্তি বারংবার মহৎ সার্থকতালাভ করিয়াছে। সেই ইতিহাস আরও বলে যে, ভারতবর্ষের অংশসমূহের ভঙ্গ-প্রবণতা বা ভঙ্গুরতাই এদেশের সর্বপ্রকার সর্বনাশের মূল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ নানা নামের মোহ দেখাইয়া, নজির উত্থাপন করিয়া, নানা অজুহাতে এদেশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে চাহিয়াছে, অনেক সময়েই পারিয়াছে—আর যত প্রকার দুঃখ দুর্দশা সমস্তই সেই ভাঙনের ফাটলে আমাদের ইতিহাসে প্রবেশ করিয়াছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা যদি সত্য হয়, তবে দেশ যাহাতে খণ্ড না হইয়া পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

এবারে ইতিহাসের মূল তথ্য কয়েকটি দেখা যাক। ঐতিহাসিককালে এদেশে কতবার সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির দেশব্যাপী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথমবার বলা যাইতে পারে মৌর্য সম্রাটদের আমলে। তারপরে গুপ্ত সম্রাটগণের পর্ব। হর্ষবর্ধনের শাসনকে পূর্বোক্ত দুই পর্বের মতো শক্তিশালী ও বহুব্যাপক বলা চলে কি না সন্দেহ। তারপরে পাঠানদের আমল। শের শাহের প্রচুর পরিমাণে উচ্চাঙ্গের শাসনপ্রতিভা ছিল বটে—কিন্তু তাহা ব্যাপক বাস্তব ও স্থায়ী রূপ লাভ করিতে পারে নাই। মোগল সম্রাটগণের সময়ে অর্থাৎ আকবরের সময় হইতে আলমগীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেশব্যাপী সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। তারপরেই আবার ভাঙন শুরু। যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাঙিয়া পড়িল। আলমগীরের মৃত্যু ১৭০৭ সালে। পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। এ দুই ঘটনার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধান। পলাশীর যুদ্ধের কামান-গর্জন মোগল সাম্রাজ্যের

সমাধির ঘণ্টাধ্বনি, আবার তাহা কেন্দ্রীয় শাসনের পতনের শব্দও বটে। এবারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল আরম্ভ হইল। ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষ যেমন একচ্ছত্র হইল—এমন খুব সম্ভব পূর্বে আর হয় নাই। অবশ্য এ যুগের রেল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি শাসনকর্তাদের যে সুবিধা দিয়াছিল—আগেকার শাসকগণ তেমন পান নাই। কিন্তু এই একচ্ছত্র শাসনের আয়ুষ্কালের পরিমাণ কত? ১৮৫৭ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ধরা উচিত। মাত্র নব্বই বৎসর।

ইংরাজ-বিদায়ে একটা যুগ শেষ হইল—কেন্দ্রীয় শাসনের, অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার যুগ। এবারে যে যুগ আসন্ন তাহার বিশেষ ধর্ম কি? প্রত্যেক কেন্দ্রীয় শাসনের অবসানে একটা সুদীর্ঘকাল-স্থায়ী ভঙ্গুরতার যুগ আসিয়াছে—এবারে কি আসিবে? ভঙ্গুরতার যুগ দেশের সর্বনাশের কারণ হইয়াছে—এবারেও কি তাহাই ঘটিবে? ভঙ্গুরতার যুগে বহিরাক্রমণ ঘটিয়াছে—এবারে কি তাহার ব্যতিক্রম হইবে? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, কিংবা ঐতিহাসিকগণ পুনরাবৃত্তি করিয়া মরেন, কোন্‌টা সত্য? অথবা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের সতর্ক করিয়া দিবে, আমরা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দিব না, ইংরাজ-কেন্দ্রীয়-শাসনের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়াই ভঙ্গুরতার যুগ আরম্ভ হইবে না,—সুদৃঢ়তর, ব্যাপকতর কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে—ইহাই আশা করা যাক্। আশা করিতে ক্ষতি কি? আশা বাস্তবের জননী।

৪

আশা করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু আশার লক্ষণ বড় দেখিতে পাইতেছি না, বরঞ্চ বিপরীত লক্ষণগুলিই অত্যন্ত অশোভনভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতেছি যে, মানুষের মন প্রাদেশিক সত্তা সম্বন্ধে যেমন সচেতন, ভারত-সত্তার প্রতি তেমনি অবজ্ঞাপূর্ণ; দেখিতেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্বন্ধে সে একান্ত উদাসীন। ভারতবাসী যেন রাতারাতি প্রদেশবাসী হইয়া

পড়িয়াছে। প্রাদেশিকতার ভূত অল্পবিস্তর সমস্ত প্রদেশকেই পাইয়া বসিয়াছে, কেহই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। প্রদেশগুলির পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-প্রত্যভিযোগের আর অন্ত নাই।

বাঙলাদেশ বিহারান্তর্গত বাঙলার অংশগুলিকে ফিরিয়া চাহিলে বিহার বলে, বাঙালী বড়ই প্রাদেশিক। কিন্তু সেই বিহার যখন উড়িষ্যার অন্তর্গত সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান নিজের ভাগে টানিয়া লইতে চায় তখন প্রাদেশিকতার গ্লানি আর সে অনুভব করে না। আসামের ইচ্ছা, কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয় তাহার সীমানার অন্তর্ভুক্ত হোক। প্রত্যেক প্রদেশের দাবীর খতিয়ান খুলিলে দেখা যাইবে দাবী অনন্ত। আর সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা এই যে, প্রত্যেক প্রদেশ নিজেকে ভারতনিরপেক্ষভাবে কল্পনা করিতে শুরু করিয়াছে।

কেন এমন হইল? প্রথম কারণ এই যে, ভারত-চৈতন্য আমাদের মজ্জাগত হইবার অবসর পায় নাই। ইংরাজ-রাজত্ব বাহির হইতে একটা ঐক্যের কাঠামো সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাহ্য ঐক্য অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিতে যে-সময়ের প্রয়োজন সে-সময় পাওয়া যায় নাই। বৃটিশ-শাসিত ভারতীয় ঐক্যের স্থায়িত্ব মাত্র নব্বই বৎসর। ইহার তুলনায় মোগল-শাসিত ভারতীয় ঐক্যের স্থায়িত্বকাল অনেক বেশি, কম করিয়া দেড়শত বৎসর হইবে। ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং ইংরেজ তাড়াইবার উৎসাহে এতকাল প্রদেশগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল—ইংরেজ চলিয়া যাওয়া মাত্র, বাহিরের বন্ধনসূত্র ছিন্ন হওয়ামাত্র, ছিন্নসূত্র তোড়ার মতো ফুলগুলি আলাদা হইয়া খুলিয়া পড়িয়াছে।

বাঙালী যেমন সর্বভারতীয়তা-বোধের সার, তেমনি বাঙালীই আবার নূতন প্রাদেশিকতা-বোধেরও গুরু। ইংরাজি-শিক্ষার সুফল এবং কুফল দুইয়েরই চরম বাঙলাদেশে ফলিয়াছে। ইতিপূর্বে সর্বভারতীয়তাবোধের উদ্ভব কিভাবে হইল সে কথা বলিয়াছি—এবার সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে কিভাবে প্রাদেশিকতাবোধের সূচনা দেখা দিল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে একটা মোড় ঘুরিবার স্থান। তৎপূর্বে আমাদের চিন্তার মাধ্যম ছিল ভারতবর্ষ। কিন্তু ভাঙা বাঙলাকে জোড়া লাগাইবার কর্মসূচী গ্রহণ করিবার পরে কখন্ অগোচরে আমাদের চিন্তার মাধ্যম হইয়া দাঁড়াইল বাঙলাদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ। কার্জনের এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ভাঙা বাঙলা আবার জোড়া লাগিল—কিন্তু আর এক উপায়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে কার্জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, ভারত-বোধে ফাটল দেখা দিল। এই সময় হইতেই প্রাদেশিকতাবোধের সূচনা।

অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতাবোধ স্থায়ীভাবে মাথা তুলিল ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রদেশ শাসনের সময় হইতে। ওই ব্যাপারটার নামই যে 'Provincial Autonomy', 'প্রাদেশিক আত্মপ্রতিষ্ঠা'। এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের ব্যক্তিগত মর্যাদাকে আচ্ছা করিয়া উস্কাইয়া দেওয়া হইল। সকলেই স্ব-স্ব-তন্ত্র এবং স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া উঠিল। প্রাদেশিকতা-বোধের ক্ষেত্রেও বাঙলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ হইতে ত্রিশ বৎসর আগাইয়া আছে। 'বাঙলাদেশ আজ যাহা চিন্তা করে—বাকি ভারতবর্ষ আগামীকাল তাহা চিন্তা করিবে'—এই বাণী আজকার নূতন পরিস্থিতিতেও সত্য।

এখন নূতন শাসনতন্ত্রে Residuary Power যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে তবেই রক্ষা, আর যদি সেই অনির্দিষ্ট এবং অপরিমিত ক্ষমতা বিবদমান পরশ্রীকাতর প্রদেশগুলির হাতে পড়ে তবেই চমৎকার! ভাব-ভারতবর্ষ ও বাস্তব-ভারতবর্ষ দুইই একসঙ্গে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। যাহা গড়িয়া তুলিতে এক শতাব্দী লাগিয়াছিল, সামান্য কয়েক বৎসরেই তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তারপর?—তারপর বৈদেশিক আক্রমণ! প্রদেশগুলির মধ্যে হানা-হানি, এবং নূতন পরাধীনতা! এইসব কথা স্মরণ করিয়াই গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, সকলেই যদি স্ব স্ব প্রদেশের পক্ষে হয়, তবে ভারতবর্ষের পক্ষে কে?—কেহই নয়। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—এইভাবে চলিতে থাকিলে বৈদেশিক নূতন করিয়া এদেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে!

আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি? চক্ষু অন্ধ তাই ভয় পাইতেছি না বটে—কিন্তু সেইজন্যই যে ভয়ের কারণ আরও বেশি! রাজনৈতিক ভারতবর্ষের অখণ্ড মূর্তি এবং ভাব-ভারতবর্ষ দুইই আজ ভাঙিয়া পড়িবার মুখে! আজ আমরা অন্তরে বাহিরে অন্ধ। একথা কাহাকে বুঝাইব? কে বুঝিবে? সকলেই যে আজ মন্ত্রী বা কনসাল হইবার জন্য ব্যগ্র। ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করিবার সময় আজ কোথায়? কিন্তু কেহই আজ বুঝিতে পারিতেছে না, যে ডালখানায় সে উপবিষ্ট তাহাই আজ সে ছেদন করিতেছে। ভারতের সংহতি নষ্ট হইলে, ভারতবর্ষ দুর্বল হইয়া পড়িলে কেবল বাঙালী বলিয়া, অথবা বিহারী বা গুজরাটী বলিয়া আমরা পৃথিবীতে কখনই প্রতিষ্ঠা পাইব না। আর ভারতবর্ষ যদি অবহেলিত হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায় তবে পৃথিবীর সম্মুখে কোন্ সম্পদ হাতে লইয়া দাঁড়াইবে? ঘরে বাইরে আমাদের মাথা হেঁট হইয়া পড়িবার আয়োজন শুরু হইয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর কীর্তিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবার আগ্রহে আধুনিক বাঙালী মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলাদেশে এখন উল্টো রথের পালা। উল্টো রথের দিনে সোজা কথাটাকেই বাঁকা লাগে—কাজেই এসব কথা এখন কাহারো ভালো লাগিবার নয়। যে দু'চারজন এই পন্থায় চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিস্তেজ, তটস্থ হইয়া তাঁহারা সমস্ত লক্ষ্য করিতেছেন আর ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্নতর হইয়া উঠিতেছেন—তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, আমাদের সম্মুখে একটিমাত্র পরিণাম, সে পরিণাম—মহতী বিনষ্টি।

বন্দে ভারতম্

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আজ আসন্ন—অথচ বাঙলাদেশের দুরদৃষ্টবশত সেই আসন্ন স্বাধীনতার ফল হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি। বাঙলাদেশের বর্তমান শাসনকর্তাগণ বাঙলাদেশটাকে ভারতবর্ষের রিপাবলিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর—তাঁহারা বলিতেছেন তাহাতেই নাকি বাঙালীর চরিতার্থতালাভ ঘটিবে। কিন্তু জাতীয় আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ বাঙালীসমাজ তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করিতে রাজি নয়। তাঁহাদের নিকটে বিচ্ছিন্ন বাঙলাদেশ নিরর্থক, নিখিলভারতীয়তার প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। বাঙলাদেশের বর্তমান শাসকমণ্ডলীর এই অযৌক্তিক জিদের ফলে বাঙালীসমাজে দাবী উঠিয়াছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয়তাবাদিগণ-কর্তৃক অধ্যুষিত অঞ্চলকে ভারতীয় রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এই দাবীর সংক্ষিপ্ত নাম হিসাবে আমরা 'ভারত-ভুক্তি' শব্দটি ব্যবহার করিব। এখন, ভারত-ভুক্তি কার্যে পরিণত করিতে হইলে বাঙলাদেশের মানচিত্রের উপরে ছুরি চালাইয়া দেশটাকে দ্বিধা করিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে বর্তমান শাসকগণের বড়ই আপত্তি, এবং অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, বিশেষ অসুবিধাও আছে। প্রধানত বাঙলাদেশের বর্তমান শাসকমণ্ডলীর দুর্মতির ফলে বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডন বা Partition করিবার দাবী আজ উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। আমার মতে ব্যাপারটা আদৌ Partition নয়, ইহাকে Partition বলাই উচিত নয়। বাঙলাদেশের দিক হইতে দেখিলে যাহা Partition বলিয়া প্রতিভাত—সমস্ত ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিলে তাহাকে বিপরীত বলিয়া মনে হইবে। ইহাকে বলা উচিত Union। অর্থাৎ, যাঁহারা বাঙলাদেশের অঞ্চল-বিশেষকে

ভারত-ভুক্ত করিতে চাহেন, Partitionist না বলিয়া তাঁহাদের Unionist বলাই উচিত। এই ভেদ কেবল নামরূপের ভেদ মাত্র নয়—দৃষ্টির ভেদ। ভারতবর্ষ যে অবিভাজ্য, ভারতবর্ষের অঙ্গরূপেই যে বাঙলাদেশের যথার্থস্থান, বাঙালী সমাজ যে ভারতীয় জাতির অন্তর্গত—দৃষ্টিভেদের মধ্যে এতখানি সত্য নিহিত আছে। তাহা ছাড়া আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। Partition শব্দটা বাঙালীর কানে বেসুরো লাগে—কারণ এককালে Partition রদ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙালীকে অনেক রক্ত, অনেক অশ্রু পাত করিতে হইয়াছে। বাঙালীর ইতিহাসে Partition শব্দটা নানা বিষাক্ত স্মৃতির দ্বারা চিহ্নিত।

হঠাৎ মনে হইতে পারে, ইতিহাসের বিড়ম্বনায় যে Partition রদ করিবার উপলক্ষে বাঙলাদেশের জাতীয় শক্তি সম্যক্‌ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—আজ সেই Partition সাধনের জন্যই বাঙালীকে আবার উদ্যত হইতে হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা আপত্তিকর মনে হইতে পারে—কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, বস্তুত তাহা নয়। সেবারের Partition রদের আন্দোলন এবং এবারের Partition সাধনের আন্দোলন একই উদ্দেশ্য-প্রসূত, মূলত কোন বিরোধ নাই এ দুয়ের মধ্যে।

সেবারের উদ্দেশ্য ছিল—বাঙালীর সংস্কৃতি এবং বাঙালী জাতির সংহতি রক্ষা। এবারও কি সেই উদ্দেশ্য নয়? গত দশবৎসরব্যাপী লীগশাসনের ফলে বাঙালীর সংস্কৃতি কি বিপন্ন হইয়া ওঠে নাই? আবার ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এ দেশে তথাকথিত পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলে সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার বিপদ কি আরও বাড়িবে না? তাহা ছাড়া, ভারতীয় জাতি হইতে খণ্ডিত হইলে বাঙালীর সংহতি, অবিভাজ্য ভারতীয় জাতি হিসাবে তাহার সংহতি দ্বিখণ্ডিত হইয়া পঙ্গু হইয়া কি পড়িবে না? বাঙলা দেশের অঞ্চল-বিশেষের ভারত-ভুক্তির দাবীর মধ্যে কি এই দুই ভাব, বাঙালীর সংস্কৃতি ও বাঙালী সমাজের সংহতিরক্ষার প্রচেষ্টাই নিহিত নয়? তবে সেবারের আন্দোলনে ও এবারের আন্দোলনে বিরোধ কোথায়? দুই-ই এক;

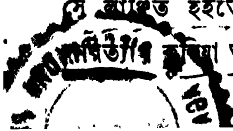
আকৃতিতে ভিন্ন, প্রকৃতিতে অভিন্ন। এই সত্যটা একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে জাতীয়তাবাদী বাঙালী দ্বিধাহীন চিত্তে ভারতভুক্তির আন্দোলনে নামিয়া পড়িতে পারিবে। নিজের ঐতিহ্যের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে—ভাবিয়া তাহারা এখনো দ্বিমনা হইয়া পিছাইয়া আছে—তাহা অন্তর্হিত হইবে—তখন একাগ্র বাঙালীসমাজ শরবৎ ঋজু গতিতে মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে। এই ভারত-ভুক্তির সমস্যাই আজ বাঙালীসমাজের নিকট সবচেয়ে জটিল, আশু সমাধানযোগ্য জীবনমরণের সমস্যা।

এখানে ভূমিকা রচনা করিয়া একটু আত্মব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমি এখানে রাজনীতি আলোচনা করিতে আসি নাই। আমার জ্ঞান ও বর্ত্তমান আসনের সীমা সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমার কথাগুলিকে রাজনীতি মনে হইলেও রাজনীতি নয়, ইহা সাহিত্যনীতির অন্তর্গত, কিংবা ইহাকে সাহিত্যের পটভূমি বলা যাইতে পারে। যুগধর্মে আদার ব্যাপারীকেও জাহাজের খবর রাখিতে হয়, যুগধর্মে সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনীতি এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া ওঠে। ভারতভুক্তি সমস্যার আলোচনা বাঙলা সাহিত্যের আলোচনারই অন্তর্গত।

ভারতভুক্তির দাবীর সহিত রাজনীতি ও অর্থনীতির যে-সব জটিল সমস্যা জড়িত, যোগ্যতর লোকে সে-সব আলোচনা করিয়াছেন, করিতেছেন, এবং সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবার পরেও করিতে থাকিবেন। এই ভারতভুক্তি দাবীর সহিত আমাদের সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা এবং জীবনের অন্যান্য অনেক সূক্ষ্ম বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাহাদের ভালোমন্দ, রীতিনীতি অনেক পরিমাণে এই দাবীর চরিতার্থতার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই আলোচনার ক্ষেত্রে যোগ্যতর লোক উদ্যোগী না হওয়া অবধি আমার মতো জ্ঞানের দিগম্বরের অগ্রসর হইয়া আসা ছাড়া উপায় নাই। ভারতভুক্তির উপরে বাঙালীর সংস্কৃতি কি-পরিমাণে নির্ভরশীল, নূতন প্রদেশ গঠন করিলে তাহাতে বাঙলা সাহিত্যের প্রকৃতির কি-পরিমাণে পরিবর্তন হইতে পারে, বাঙালী সমাজের

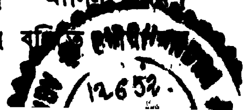
জড়তার নির্মোক মোচন ও নবজাগরণের পক্ষে ভারতভুক্তি যে একান্ত আবশ্যক, ভারতভুক্তি কেবল একটা রাজনৈতিক প্রয়োজন মাত্র নয়, মহত্তর আধ্যাত্মিক প্রয়োজন—এইগুলিই আজ আমার আলোচনার বিষয়; এবং এসব আলোচনা যে সাহিত্য-সভার পরিধির অন্তর্গত তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

একথা আজ আর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বাঙালীর জীবনে একটা সামগ্রিক নিষ্ফলতা ও আধ্যাত্মিক ধিক্কার দেখা দিয়াছে। সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রশক্তিতে, সাহিত্যে যে কোটালের বন্যা একদিন সমস্ত বাঙলা দেশকে উন্মুখর করিয়া তুলিয়াছিল, যে বন্যার কলধ্বনি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—আজ তাহার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নাই; আজ 'সে প্রচণ্ড গতি অবসান'—আজ ভাঁটার কাদা হাতড়িয়া পুরাতন গৌরব উদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় আমরা নিযুক্ত। আজ বাঙালীসমাজ ভারতবর্ষের সমাজে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামিয়া পড়িয়াছে। এজন্য আমরা অনেক সময়ে নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই অপরাধী করি—ক্ষীয়মাণ প্রাণশক্তির ইহাও অন্যতম লক্ষণ, তখন নিজের দোষকে আর দোষ মনে হয় না, বরঞ্চ তাহা এক প্রকার গুণ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। আজ বাঙলাদেশ যে দুরবস্থায় উপনীত, কার্য-কারণ শৃঙ্খলে ক্ষীয়মাণ প্রাণশক্তির সহিত তাহা জড়িত। এতদিন যাহার মৃদুরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—রাজনীতিক্ষেত্রে তাহা চরম আকার ধারণ করিতেই সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিয়াছি। অনেককাল আগে একবার প্রবাসী বাঙালীদের উদ্দেশে বলিয়াছিলাম তাঁহারা যেন স্বদেশবাসী বাঙালীর কাছে কোনরূপ সাহায্য না আশা করেন। কারণ অপরকে সাহায্য করিবার শক্তি বাঙালীর নাই, নিজেকেও সে বাঁচাইতে অসমর্থ। তখন বলিয়াছিলাম, অচিরে এমন দিন আসিবে যখন য়িহুদি-সমাজের ন্যায় সর্বত্র সে আশ্রিত হইতে থাকিবে, নিজের দেশে তাহার স্থান হইবে না, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে। অদৃষ্টের অমোঘ ইঙ্গিতে



আজ কি তাহাই হইয়া ওঠে নাই? কিছুকাল আগেও প্রবাসী বাঙালীগণ স্বদেশবাসী বাঙালীকে ঈর্ষা করিত, আর এখন, একটু রূঢ়ভাবেই বলা যাক্, অধিকাংশ বাঙালী, বিশেষত পূর্বোত্তরবঙ্গবাসী বাঙালী দীনতম প্রবাসী বাঙালীর সৌভাগ্যকে কাম্য বলিয়া মনে করিতেছে! শুধু তাহাই নয়, অন্যান্য প্রদেশের বিরুদ্ধে আমাদের যে-সব ছোটখাটো অভিযোগ ছিল সে-সব ভুলিয়া গিয়া আমরা এখন ভারতভুক্তির দাবী উত্থাপন করিয়াছি। আজ আমরা বাঙালীর দুরদৃষ্টের একটা চরম সঙ্কটস্থলে আসিয়া পৌছিয়াছি—একেবারে চরমতম কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

বাঙালীর এই সামগ্রিক নিষ্ফলতার কারণ কি? নিশ্চয়ই বহুতর কারণ আছে—আমার বিশ্বাস তাহাদের অন্যতম হইতেছে যে, আমরা, বাঙালীরা, স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে অগোচরে, স্বার্থপ্রণোদিতভাবে, ভ্রান্ত আদর্শের উদ্বোধনে—ভারতবর্ষের সহিত বাঙলার যোগসূত্রটাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছি। কোন্ দুষ্ট গ্রহের অভিশাপে জানি না, ভারতীয়তাবোধের উপরে বাঙালীয়ানা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আমাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বিধাতা যাহাদের বিশেষভাবে বাঙালী করিয়া গড়িয়াছেন, ভারতীয় হইবার তাহাদের আর প্রয়োজন কি? বিধাতা মানুষের সব কথা শোনেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু এ কথাটা শুনিয়াছেন এবং নিশ্চয় খুব একচোট হাসিয়া লইয়াছেন। যাহারা ভারতসূত্র ছিন্ন করিতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইবার জন্য আজ তাহাদের কি আকিঞ্চন! এমন ঘটনায় বিধাতা তো দূরের কথা, মানুষেরই হাসি পাইবার বিষয়! ফল কথা—ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে আমাদের আত্মনির্বাসন, বহুল পরিমাণে বাঙালীর বর্তমান দুর্বলতার কারণ। এখন, এই ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে আত্মনির্বাসনের ভাব বাঙালীর মনে আসিল কিরূপে? আসিল কখন? ব্যাপারটা জটিল-গবেষণা-সাপেক্ষ হইলেও মোটের উপরে বলিতে [illegible]



বঙ্গভঙ্গ-রদের সময় হইতেই, ওই আন্দোলনের ব্যাপার হইতেই এই ভাবের উৎপত্তি। শুনিতে অদ্ভুত লাগিলেও বস্তুটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পরোক্ষ ফল বাঙলাদেশের সহিত ভারতবর্ষীয় সমাজের ক্ষীয়মাণ যোগ। আমরা ভাঙা বাঙলাকে জোড়া লাগাইতে গেলাম, বাঙলা জোড়া লাগিল, কিন্তু আসলে কপাল ভাঙিল, ভারতবর্ষের সহিত আমাদের জোড় ভাঙিয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে স্বদেশকে পাইলাম তাহা ভারতবর্ষ নয়, বাঙলাদেশ!

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল"
এবং "বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন"

প্রভৃতি ভাব যেমন ভাবে আমাদের মন হরণ করিল ভারতবর্ষীয় ভাব তেমন করিয়া করিল না। তখন আমাদের কবি, ভাবনায়ক, রাষ্ট্রনায়কগণ প্রয়োজনের তাগিদে 'আমরা বাঙালী' এই গজালটির উপরে এত দমাদম হাতুড়ি মারিয়াছেন যে সেটা খুব শক্ত করিয়া আমাদের মনের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। অবশ্য তাঁহারা এমন কথা বলেন নাই যে 'আমরা ভারতীয় নই'—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? জনসাধারণের চিত্ত ভারতীয় ও বঙ্গীয় এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহা অনুক্ত বা আভাষে মাত্র উক্ত তাহাকে বাদ দিয়া যাহা অত্যুক্ত তাহাকেই জনচিত্ত সবলে গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয়তাবোধের উপরে বাঙালীয়ানাবোধের ইহাই গোড়া-পত্তন। তখন ব্যাপারটা অঙ্কুরে ছিল, ভূমিগর্ভনিহিত ছিল, চক্ষুর অগোচরে ছিল, লোকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ছিল যে তাহাতে সন্দেহ কি—নতুবা বিষ-ফল-প্রসূ এই বিষ-বনস্পতি আসিল কোথা হইতে?

অথচ রহস্য এই যে, আধুনিক যুগে বাঙালী মহাপুরুষগণই ভারতবর্ষীয় সমাজ বোধের ও ভারতচৈতন্যের স্রষ্টা। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ

অবধি। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ যেখানে যে-কেহ চিন্তা করিয়াছেন—তাঁহাদের চিন্তার মাধ্যম ছিল ভারতবর্ষ। তাঁহারা সকলেই বাঙালী ছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন মাধ্যমে চিন্তা করিতে তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বদেশী মেলার আমলে যে সব স্বদেশী গান রচিত হইয়াছিল—সবগুলিতেই ভারতবর্ষ ছিল লক্ষ্য—বাঙলাদেশের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নাই—কেন না তাঁহারা জানিতেন ভারতবর্ষের উন্নতি হইলে বাঙলাদেশের উন্নতি হইবেই। ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া বাঙলাদেশের অস্তিত্ব তাঁহাদের কল্পনায় ছিল না। এই মৌলিক ভারতবোধ—যাহা বাঙালী মহাপুরুষগণেরই মন্ত্রদৃষ্টির ফল—হঠাৎ তাহা লুপ্তপ্রায় হইল কেন? ভারতীয়তাবোধ ক্ষীণ হইয়া প্রাদেশিকতা-বোধ উগ্রতর হইতে গেল কেন? আমার বিশ্বাস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে 'বঙ্গ' এই শব্দটির উপরে অত্যধিক ঝোঁক পড়িবার ফলেই, এবং জনচিত্তে তাহার বিকৃতিজাত প্রভাবের ফলেই মূলত এমনটি ঘটিয়াছিল। তারপরে অন্যান্য কার্যকারণের জলসেচনে এই বিষবৃক্ষ বর্ধিত হইয়া বিষফল প্রসব করিতেছে। এখন হঠাৎ ফল দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলে চলিবে কেন। তবু রক্ষা এই যে, চমকিয়া উঠিবার মতো প্রকৃতিস্থতা ও সৎসাহস এখনো লোপ পায় নাই। বিষফলকেই সুধাফল বলিয়া আনন্দিত হইলেই—ষোলকলা পূর্ণ হইত! যাই হোক, অন্তত সে বিপদ হইতে যে বাঁচিয়া গিয়াছি ইহাও কম আনন্দের বিষয় নহে।

আবার একটা প্রাদেশিক আন্দোলন আসন্ন—আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও চলে। এ আন্দোলন প্রাদেশিক হইলেও পরিণামের বিচারে সর্বভারতীয়। এবারে আর খণ্ডিত বাঙলা দেশকে জোড়া দিবার চেষ্টা নয়—এবারে খণ্ডিতব্য ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা, যাহাকে আমরা পূর্বে ভারতভুক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এবারকার আন্দোলনে বাঙলাদেশ শব্দটার উপরে ঝোঁক পড়িবার আশঙ্কা নাই—এবারে ঝোঁক পড়িবে ভারতবর্ষ শব্দটার

উপরে। এই আন্দোলনের ফলে প্রদেশ-সচেতনতার যে কঠিন স্তর আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বিদীর্ণ হইয়া নিখিল ভারতের অমৃত-নদী উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে—বুঝি আমরা প্রাদেশিকতার অনুর্বর মোহ হইতে উদ্ধার পাইতে চলিলাম!

বাঙলাদেশের সামগ্রিক ব্যর্থতার প্রধান কারণ আমাদের মনে নিখিল ভারতীয়তা বোধের ক্ষীয়মাণতা। গঙ্গার ধারার সহিত যোগের শিথিলতার জন্যই বাঙলার ভাগীরথী অমিতবারি নয়—গ্রীষ্মকালে তাহা শুষ্কপ্রায়। যে পরিমাণে আমাদের চিত্ত ভারতবর্ষের রসজাহ্নবী হইতে লুপ্তযোগ—সেই পরিমাণে আমরা বন্ধ্যাদশা প্রাপ্ত হইয়াছি। হিমালয়ের চিরতুষার যেমন গঙ্গাযমুনাকে চিরবহমানা করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষের যুগযুগান্তসঞ্চিত তপস্যা ও সংস্কৃতিই সমস্ত প্রাদেশিক সরসতার মূল কারণ। কোন প্রদেশ এই চিরন্তন সত্যকে বিস্মৃত হইলে নিজেকেও বিস্মৃত হয়—কারণ প্রত্যেক প্রদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত মিলিত হইয়াই মাত্র সত্য।

বাঙলা দেশ যদি যথার্থভাবে ভারতভুক্তিকে গ্রহণ করিতে পারে, কেবল ইহার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংকেত মাত্র নয়, ইহার আধ্যাত্মিক অর্থকে প্রণিধান করিতে সক্ষম হয়—ভারতমহাসমুদ্রে অবগাহন করিতে দ্বিধাবোধ না করে, তবে তাহার আধ্যাত্মিক জড়তা, সংস্কৃতির অনুর্বরতা, কর্মকীর্তির বন্ধ্যাত্ব দূর হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এইভাবেই বাঙলাদেশ তাহার গৌরবময় ইতিহাসের নবগৌরবভূয়িষ্ঠ নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতবর্ষের অবিভাজ্যতা আমরা স্বীকার করি—ভারতবর্ষের অখণ্ডতা আমাদের কামনার বিষয়। কাজেই তথাকথিত পাকিস্থান স্থাপনের ফলে এই দেশের মধ্যে যে দ্বিধা হইতে চলিয়াছে তাহাতে স্বভাবতই আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কথা। কিন্তু বাস্তবকে যথোচিত সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করাই উচিত। সেই বাস্তব বুদ্ধিই বলিয়া দিতেছে যে, ভাবের সূত্রে ভারতবর্ষ চিরকাল

অচ্ছেদ্য এবং চিরসংযুক্ত থাকিয়াও বাস্তবের তাড়নায় বহুধা বিভক্ত হইতে ভয় করে নাই। এদেশের ইংরাজশাসন পর্বটাকেই একান্তভাবে না দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, মৌর্য সম্রাটদের আমল হইতে ইংরাজদের কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ কোন একসময়ে একসঙ্গে দুইশত বৎসরের অধিক একীকৃত থাকিয়াছে কিনা সন্দেহ! এই একতার অভাবে রাজনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছে—কিন্তু ভাবনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছে কি? অর্থাৎ রাজনৈতিক বিভাজ্যতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড ছিল। এবং যতদিন ভারতবর্ষের ভাবসূত্র অখণ্ড থাকিবে, কখনো কোন কারণে পর্ববিশেষের জন্য এদেশ খণ্ডিত হইলেও ইহার প্রাণসত্তায় আঘাত পড়িবে না। কেননা, আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, ভারতবর্ষ একটা ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়—ভারতবর্ষ একটি আইডিয়া। এই মহৎ আইডিয়া তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে, তাহার রাজনীতি, তাহার ব্যবসাবাণিজ্য এবং তাহার পার্থিব উত্থানপতন ও বন্ধুরতার মধ্যে সক্রিয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই অবিভক্ত আইডিয়ার অনুষঙ্গী রূপে দেশের ভৌগোলিক চৌহদ্দিকে অবিভাজ্যরূপ দানের নিমিত্ত এ দেশের মহৎ রাজনীতিকগণ ও মহাপুরুষগণ কালে কালে চেষ্টা করিয়াছেন—কখনো সফল হইয়াছেন, কখনো সাফল্য আশানুরূপ হয় নাই। এইসব মহৎ রাজনীতিকদের ধারা অশোক, হর্ষবর্ধন, আকবরের মধ্য-দিয়া প্রবাহিত হইয়া জহরলাল নেহেরু পর্যন্ত আসিয়াছে। এইসব মহাপুরুষদের ধারা বেদব্যাস, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের বাস্তব ও ভাবগত অখণ্ডতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে রাজনীতিকদের চেয়ে মহাপুরুষদের সফলতা অধিকতর প্রকট—বাস্তবত ভারতবর্ষ কখনো কখনো একীভূত হইয়াছে মাত্র—ভাবত ভারতবর্ষ কখনো বিভক্ত, কখনো ন-একীভূত হয় নাই। ভারতবর্ষের প্রাণ তাহার ভূগোলে নয়—তাহার ইতিহাসে, এই আইডিয়াগত ইতিহাসে। যতক্ষণ এই প্রাণ সক্রিয় আছে—ততক্ষণ দেশের সাময়িক দ্বিধায় কিছুমাত্র ভয়ের

কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙলাদেশের ভারতভুক্তিতে এই প্রাণকে সক্রিয় করিয়া তুলিবে বলিয়া আশা হয়। তথাকথিত পাকিস্থান স্থাপনে দেশ যেটুকু দুর্বল হইবে—তদধিক অনেক সবল হইবে বাঙলাদেশের ভারতভুক্তি ঘটায়। কাজেই এই ঘটনা ভারত-ইতিহাসের যুগলক্ষণাক্রান্ত একটি ব্যাপার। ভারতসত্তাকে অধিকতর প্রাণবান করিতে সমর্থ হইবে ভাবিয়া বাঙালী গৌরব করিতে পারে, অন্তত এ বিষয়ে গৌরববোধ করিলে কেহ তাহাকে ন্যূন মনে করিবে না। এমন গৌরবের বিষয় জাতির জীবনে সচরাচর ঘটে না।

গৌরবের কথা, আনন্দের কথা এইজন্যে যে, ভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য, ভারতীয় নাগরিক হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা হিন্দু হই আর বাঙালী হই—এ পরিচয় আমাদের অসমাপ্ত পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়—আমাদের পূর্ণ পরিচয় আমরা ভারতীয়। যদি এখনো সেই ভারতীয়ত্বে না পৌঁছাইতে পারি তবু দুঃখ নাই, কিন্তু লক্ষ্যসচেতন থাকা কর্তব্য। মনে রাখা উচিত ভারতভাগ্যবিধাতার হাতে আমরা উপকরণ মাত্র। তিনি এদেশের বিচিত্র প্রদেশকে, বিভিন্ন সমাজকে, সমস্ত উপজাতিকে ওই একই উদ্দেশ্যে, একই লক্ষ্যে পরিচালিত করিতেছেন—সেখানে যখন পৌঁছিব —দেখিতে পাইব আমরা বাঙালী হইয়াও ভারতীয়, আমরা হিন্দু হইয়াও ভারতীয়, আমরা প্রাদেশিক হইয়াও সর্বদেশিক; দেখিব মধ্যপথে এই দুইয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করিয়াছিলাম পথের অন্তে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইব এই মহাদেশের সমস্তগুলি নদীপ্রবাহ একই ভারত-মহাসমুদ্রে পরমবাঞ্ছনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে। পাকিস্থান-প্রয়াসীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁহারা এই পরিণামের, এই লক্ষ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষকে অতিক্রম করিয়া নূতন ও পৃথক রাষ্ট্রগঠন সম্ভব, এই অদ্ভুত যুক্তির তাড়নায় এমন অসম্ভব কথাও তাঁহাদের বলিয়া ফেলিতে হইয়াছে যে, তাঁহারা ভারতীয় নন। এসব কথা তাঁহারা সত্যসত্যই বিশ্বাস

করেন মনে করিলে তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপরে অনাস্থা প্রকাশ করিতে হয়। আসল কথা, রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে অনেক কথাই লোককে বলিতে হয়। দুষ্ট রাজনীতির সরস্বতী মাথায় চাপিলে হেন কিম্ভূত কথা নাই মানুষে যাহা না বলিতে পারে। কিন্তু এই দুষ্ট সরস্বতীর অপেক্ষা যে-ভারতভাগ্যবিধাতা অতি প্রাচীন কাল হইতে বহুতর বহিরাগত জাতিকে ভারতীয় জাতিতে পরিণত করিয়াছেন—তাঁহার উপরেই বিশ্বাস রাখা কি অধিকতর বাস্তবসম্মত নয়? আশা করা যায় তিনিই কিছুকালের মধ্যে লীগ-দলভুক্ত মুসলমান সমাজের স্কন্ধ হইতে পাকিস্থানীভূতকে নামাইয়া দিবেন—তথাকথিত পাকিস্থানের খণ্ডগুলি চিরন্তন ভারতস্থানের সহিত অতিভৌগোলিক আধ্যাত্মিকসূত্রে জড়িত হইয়া ধন্য হইবে।

নূতন পরিকল্পনা অনুসারে প্রদেশ গঠিত হইলে বাঙলা সাহিত্যের প্রবাহ আবার তাহার পুরাতন খাতে ফিরিয়া আসিবে। এই প্রদেশই হইবে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য, দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গেরই সৃষ্টি। কোম্পানীর শাসনের আমলে কলিকাতা শহর বাঙলাদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্রে পরিণত হইলে এই শহর বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে—আর অপেক্ষাকৃত ইদানীংকালে বাঙলা সাহিত্যের প্রভাব পূর্ববঙ্গে প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই, প্রধানত ভাগীরথীধারাকে অনুসরণ করিয়াই তৎসংলগ্ন ভূখণ্ডে বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। নূতন প্রদেশ গঠিত হইলে, কলিকাতা অবশ্যই সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র থাকিবে—কিন্তু সাহিত্যের ভাবকেন্দ্র বিচলিত হইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যের প্রভাব পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে আত্মপ্রসার করিতেছিল। এই প্রসৃতি স্থগিত হইবার কারণ ঘটিতে চলিয়াছে। বাঙলাভাষাকে বিকৃত করিয়া ফেলিবার দিকে, মুসলমান-সমাজের অংশবিশেষের ঝোঁক আছে বলিয়া আশঙ্কা করিলে অমূলক হইবে না। ইহার পশ্চাতে মুসলমান সাহিত্যিকগণের সমর্থন আছে কি

না জানি না—কিন্তু কালের গতিকে শিক্ষিতব্যক্তি ও সাহিত্যিকদের প্রভাবের অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদেরই প্রভাব অধিকতর কার্যকরী। বাঙলা ভাষার এই পাকিস্থানীকরণ যদি চলিতে থাকে—তবে বাঙলাদেশের পাকিস্থান অংশে তাহার পরিণাম নিতান্ত আশঙ্কাজনক। সেইজন্যই বলিতেছিলাম—বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিবে নূতন প্রদেশ।

তবেই দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে বাঙলা সাহিত্যের তিনটি কেন্দ্র দেখা দিবে। প্রধান ও প্রথম—নূতন গঠিত প্রদেশ, দ্বিতীয়—পূর্বোত্তরবঙ্গের তথাকথিত পাকিস্থান, তৃতীয়—ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালী সমাজ। এই তিনের মধ্যে সমন্বয়-সাধন ও ভারসাম্য-রক্ষার ভার পড়িবে নূতন প্রদেশের উপর। নূতন প্রদেশের সাহিত্যিকদের মনীষা, সাধনা ও সংগঠন-শক্তির উপরে অপর দুইটি কেন্দ্রের মানসিক স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। তাহা ছাড়া, অপর দুইটি কেন্দ্রের সমস্যাও অনেক পরিমাণে ভিন্ন। পূর্বোত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক ও শিক্ষিতব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত প্রভাব ও অর্থলোভ হইতে আত্মরক্ষায় যত্নবান হইতে হইবে। অর্থলোভের উল্লেখের কারণ এই যে, টাকা দিয়া শাসকগণের আদর্শ অনুযায়ী বাঙলা পুস্তক লিখাইয়া লইবার চেষ্টা চলিতে থাকিবে—সে চেষ্টা এখনও হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে চলিতেছে। আবার প্রবাসী বাঙালী সমাজের সমস্যা আর এক প্রকারের। তাঁহাদের পক্ষে আত্মরক্ষার চেয়ে আত্মবিসর্জনের আবশ্যক অনেক বেশি। তাঁহারা একেবারে ভারতীয় প্রবাহের মাঝদরিয়ায় বাস করিতেছেন। এই পুণ্যপ্রবাহকে, এই জীবনদায়িনী ধারাকে যত অধিক পরিমাণে তাঁহারা আত্মসাৎ করিতে পারিবেন তত অধিক তাঁহাদের মঙ্গল—এবং পরোক্ষত সমস্ত বাঙালী সমাজের মঙ্গল। আমরা বাঙালী, প্রবাসী বাঙালী, আমরা দেশের অধিবাসীদের হইতে স্বতন্ত্র, উন্নততর—এই অমূলক ধারণা সর্বাংশে বর্জন করিতে হইবে—এমনকি তজ্জন্য যদি বাঙালীয়ানাকে বিস্মৃত হইতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু না ঘাটকা না ঘরকা হইয়া থাকা আর চলিবে না।

নূতনপ্রদেশবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের দায়িত্ব গুরুতর। সাহিত্য-রচনাতেই তাঁহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ রাখিলে হইবে না, অপর দুটি কেন্দ্রের সংস্কৃতির শুভাশুভ রক্ষার দায়িত্বও তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙালী সাহিত্যিকগণ সকলেই ইংরাজি জানেন—ইংরাজি ভাষার বাতায়নে বিশ্বের বাতাসের স্পর্শ তাঁহারা পাইয়া থাকেন—কিন্তু এবারে ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠতর যোগও তাঁহাদের রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, কাজেই তাঁহারা যদি কিছু পরিমাণে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন—তবে সে শ্রম নিতান্ত ব্যর্থ শ্রম হইবে মনে করিবার কারণ নাই। ভারতবর্ষের ভাবনিশ্বাস হিন্দি ভাষাতেই স্পন্দিত। সেই স্পন্দন বিশ্বের বুকে অনুভব করিতে সক্ষম হইলে কেবল যে ভারতবর্ষের সত্যকার পরিচয় জানা যাইবে এমন নয়—ভারত-মহাসমুদ্রের এই বায়ুপ্রবাহে জীবনটাও ভাবসম্পদে অধিকতর স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিবে—ইহাতে সর্বৈব মঙ্গল—অমঙ্গলের কোন কারণ দেখি না।

সত্য কথা, আজ আমরা বাঙালীর জীবনেতিহাসের এক নূতন ও গৌরবময় অধ্যায়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—এ সুযোগ নষ্ট হইলে, এ সুযোগের পূর্ণ ফল আদায় করিয়া লইতে না পারিলে বাঙালী সমাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু নয়, সংস্কৃতিগত মৃত্যু—মৃত্যুর যাহা প্রকৃতরূপ। ভারতভুক্তির সুযোগ এত সহজে, এত সত্বর আসিবে আমার কল্পনাতীত ছিল—কাজেই আর দ্বিধা নয়, শঙ্কা নয়, মঙ্গলময় পরিণাম নিশ্চয় জানিয়া রত্নোদ্ধারের আশায় ভারতসমুদ্রে কায়মনোবাক্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ি। *

"বন্দে ভারতম্"

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভার সভাপতির অভিভাষণ। (২৬শে হইতে ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪)

শিল্পের মুক্তি

এই জামসেদপুর শহর আর এখানকার সমাজের সহিত পরিচিত হ'বার ইচ্ছা আমার দীর্ঘকালের। জামসেদপুরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অধিকাংশ শহরের মূলগত পার্থক্য এই যে, এই শহরটি মানুষের জীবনের একটি নূতন অধ্যায়ের প্রতীক। সেই অধ্যায়টিকে বলা যায় যন্ত্রবাদ। মানুষ এক সময়ে ছিল যাযাবর, তার পরে হয়েছে কৃষক, তার পরে হয়েছে সে যন্ত্রশিল্পী। যাযাবরের শিকারের ধনুক বা গদাও যন্ত্র, কৃষকদের লাঙল বা তাঁত বা চরকাও যন্ত্র। কিন্তু যন্ত্রবাদের যন্ত্র ওসব থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন। এই ভেদটা কোথায়, বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতি তা সহজে বুঝতে পারে। আর বুঝতে না পারলেও সাহিত্যসভা তা বিচারের ক্ষেত্র নয়। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, যন্ত্রবাদ মানুষের জীবনে একটা নূতন অধ্যায় ও নূতন তত্ত্বের অবতারণা করেছে। সেই অধ্যায় ও তত্ত্বের বস্তুগত প্রতীক জামসেদপুর, আমাদের দেশের বৃহত্তম প্রতীক ব'লেই জানি। যন্ত্রবাদ বা তার পরিণাম সম্বন্ধে আমার মত যাই হোক, তার সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। সেই ইচ্ছার টান এখানে আসবার একটা হেতু।

কাল আপনাদের এখানে রক্তকরবীর অভিনয় হ'ল। অভিনয়ের নৈপুণ্য সকলকেই আনন্দ দিয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে এত নাটক থাকতে, রবীন্দ্রনাথের এত নাটক থাকতে, অভিনয়ের জন্য আপনারা রক্তকরবী নাটকখানা যে নির্বাচন করেছিলেন, অবশ্যই তার একটা কারণ আছে ব'লে মনে হয়। হয়তো ওই নাটকখানার বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে এখানকার জীবনযাত্রার কোন প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যের তাগিদ আপনাদের মনে পৌঁছেছিল। একটি বিষয় আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, রক্তকরবীতে কারো অবসর নেই।

ওখানকার জীবনযাত্রার মানচিত্র এমন সুকৌশলে নিয়মিত যে, কাজের মরুজিহ্বা সকলের সময়কে এমন ক'রে শুষে নিয়েছে যে, কোথাও এতটুকু অবসরের মরূদ্যান দেখা দিতে পারেনি। যন্ত্রবাদের পক্ষে অবসর বড় বালাই। অবসর মানুষকে চিন্তা করায়, চিন্তা মানুষের মনকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে, সে বিদ্রোহ যন্ত্রপুরীর যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে আশঙ্কায় বড়সর্দার, মেজো-সর্দার, ছোটসর্দার প্রভৃতি মিলে ওখানকার মানুষের জীবন থেকে অবসরকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। একমাত্র নবাগন্তুক নন্দিনীর ওখানে অন্তহীন অবসর। এই অবসর-সরোবর-বিলাসিনী রাজহংসী কোন্ অপরিচিত দয়িতের পত্র বহন ক'রে যক্ষপুরীতে এসে উপস্থিত। নন্দিনীর অতর্কিত অবসরের হিসাব মেলাতে না পারাতে যক্ষপুরীতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। ওখানকার আর একটি লোকের জীবনে অবসর ছিল। বিশু পাগল। এই অবসরটুকু পাওয়ার জন্যে তাকে পাগল হ'তে হয়েছে। আর সকলেরই জীবন কাজ আর নেশা দিয়ে ঠাসা।

বর্ত্তমান যুগের সমস্ত শহরগুলোই অল্পবিস্তর পরিমাণে যক্ষপুরী; যন্ত্রবাদের শহরগুলো তো নিশ্চয়ই। মানুষের প্রকৃতিগত শক্তির উদারতা জটিলীকৃত জীবনের জালের আড়ালে প্রচ্ছন্ন, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, সেটুকু মানুষ-ছাঁটা রাজা, তার নাম মকররাজ। আর যক্ষপুরীর আমরা সকলে ব্যক্তি নই, সংখ্যা মাত্র, ৬১ত, ৪৭ফ, ৭১ট,—আমরা বাস করি ট-ঠ পাড়ায়।

এই কাজে-ঠাসা যক্ষপুরীতে অবকাশ-বিনোদিনী নন্দিনী হচ্ছে শিল্পকলা-লক্ষ্মী। সে দরজায় দরজায় সেধে বেড়াচ্ছে, সাড়া দেবার মতো কারো অবকাশ নেই। এক একবার দেখে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে—কিন্তু অমনি সর্দারদের চোখ মনে পড়ে,—এক একবার ব'লে উঠি, "আমরা নিরেট নিরবকাশ গর্ত্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।" কিন্তু ওই পর্য্যন্তই—যক্ষপুরীর জীবন-জাল ছিন্ন করবার শক্তি কবে হারিয়ে ফেলেছি।

রক্তকরবী নাটকে শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর জয় হয়েছিল বটে, কিন্তু রঞ্জনকে হারাবার মূল্যে, মকররাজ শেষ পর্যন্ত জালায়ন ছিন্ন করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু নিজের কীর্তিকে ধ্বংস করবার মূল্যে; বাস্তব যক্ষপুরীতে মানুষের মুক্তির সেই লগ্ন আজও আসেনি, কবে আসবে জানি না; কিন্তু ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি, শিল্পলক্ষ্মী নন্দিনী দ্বারে দ্বারে সেধে বেড়াচ্ছে। তার পথে বাধা বিস্তর। নন্দিনীর উদ্দেশে অর্ঘ্যবচনার এই সভায় তার পথের বাধা সম্বন্ধেই আলোচনা করবো।

বর্তমান যুগে এবং বর্তমান পৃথিবীতে, শুধু বাঙলাদেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব দেশে মহৎ শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে প্রধান অন্তরায় তিনটি—মনদৈন্য, প্রাদেশিকতা আর দলীয়তাবাদ।

২

সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত—এক কথায় যাকে আমরা শিল্প বলি—সে সমস্তই হচ্ছে অবসরের ফসল। মানব-জমিন আবাদ করতে জানলে যে-ফসল জন্মায়, শিল্প হচ্ছে তাই। মহাপুরুষদের জীবনও শিল্প, সব শিল্পের সেরা; মানব-জমিন আবাদের প্রত্যক্ষ ফসল। পৃথিবীর বর্তমান শিল্পের অবস্থার দিকে তাকালে স্বীকার করতেই হবে যে, শিল্প-মন্দাকিনীতে ভাঁটার টান বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, প্রধান কারণ—মানুষের জীবন থেকে অবসরের সত্যযুগ গতপ্রায়। যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে মানুষ ভেবেছিল যে, যন্ত্র তার কাজের ভার লঘু ক'রে দিয়ে তাকে এমন মুক্তি দেবে, যাতে মানুষ অবসরের প্রাচুর্যকে উদারতর ভাবে পাবে। কিন্তু বস্তুত দেখছি, তা ঘটে ওঠেনি। যন্ত্রের প্রশ্রয়ে যারা ধন পুঞ্জিত করেছে, তাদের অনেকের জীবনে সময়ের প্রাচুর্য ঘটেছে বটে, কিন্তু সেই অবসরকে কি তারা আবাদ করতে জানে? তাদের জীবনের প্রচুর অবসর যেন পতিত জমি, তাতে হল-রেখা মনঃ-প্রকর্ষের চিহ্ন অঙ্কিত করে না, তাতে কেবল আগাছা জন্মে, প্রতিবেশীর স্বাস্থ্য নষ্ট

করে। আর এ যুগের অধিকাংশ লোক, যারা যন্ত্রপীড়িত—রক্তকরবীর কবি যাদের বলেছেন 'রাজার এঁটো'—তাদের জীবনে অবসর কোথায়? কেবল শিল্পীর জীবনে অবসরের প্রাচুর্য থাকলে চলবে না; পাঠকের জীবনে, শ্রোতার জীবনে, দর্শকের জীবনে—সমগ্র সমাজের জীবনে অবসর চাই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটা বাড়ির পক্ষে স্বাস্থ্যকর থাকা সম্ভব নয়। অবসরের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সমাজে একজন লোকের অবসর কোনো কাজের নয়। লেখকের সহিত পাঠকের, শ্রোতার সহিত বক্তার, নাটকের সহিত দর্শকের যোগের মাধ্যমে হচ্ছে অবসর, আকাশটা ফাঁকা ব'লেই সূর্যকিরণ তাতে রামধনুকের তুলি চালাতে পারে। আজ মানুষের জীবনের অন্তরীক্ষলোক যে কাজের বস্তুপুঞ্জ দিয়ে ঠাসা, কল-কারখানার ধোঁয়ার তুলি ছাড়া আর কোন রঙ তাতে ধরে না। এখন যেটুকু অবসর আমরা পাই, তাকে উপভোগ করবার জন্য শিল্পচর্চা করিনে, কোনরকমে তাকে উত্তীর্ণ হবার জন্যই বই নিয়ে বসি। বলি, দাও তো হে একখানা বই, সময় কাটছে না। অনভ্যাসে এমনি অবস্থা হয়েছে যে, হাতে একটু সময় পড়লে তাকে নিয়ে কি করবো ভেবে পাইনে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কেবল একজন মহাকবির মৃত্যু ঘটেনি, খুব সম্ভব পৃথিবীর শেষ মহাকবি অন্তর্হিত হয়েছেন। আজকার পৃথিবীতে বার্নার্ড শ'কে বাদ দিলে আর কোন মহালেখক আছেন কি? আর শ' তো এযুগের লোক নন্। যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে তাঁর জন্ম, যন্ত্রযুগের মূর্তি প্রকট হবার আগেই তাঁর জীবন উপাদান সংগ্রহ করেছিল। খুব সম্ভব এর পরে আর কোন বিশ্বজিৎ মহালেখক হবেন না, সবাই হবে অল্প-বিস্তর local সাহিত্যিক; কারণ যন্ত্রবাদ কেবল আমাদের অবসরকেই হরণ করেনি, অনাবশ্যকভাবে আমাদের জীবনকে জটিল ক'রে তুলেছে। এই জটিলতাকে আত্মসাৎ ক'রে রস বার করতে পারে, সর্বমানবগ্রাহ্য রস, মানুষের জীবনপরিধিকে সর্বানুভূতির বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন ক'রে ধরতে পারে—এমন বেদব্যাস শিল্পজগতে আর জন্মাবেন কি না, নিতান্ত সংশয়ের বিষয়।

শিল্পের ভাঁটা আজও হয়তো সকলের চোখে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েনি, তার কারণ আমরা যন্ত্রযুগের সূত্রপাত-সীমায় এখনো আছি। অবসরের যুগ এখনো আমাদের বহুদূরগত নয়। মানুষের পরিজ্ঞাত ইতিহাসের পাঁচ হাজার বৎসরের শিল্পসৃষ্টি এখনো খুব দূরে গিয়ে পড়েনি, এখনো আমরা তার রসের ভাগ পাচ্ছি। কিন্তু এখন যন্ত্রযুগের তো কেবল শুরু, আরও দুশো বছর যাক্। ইতিহাসের শিল্পসঞ্চয় আরও দুশো বছর পিছিয়ে পড়ুক, জীবনের অবসর আরও সংকীর্ণ হয়ে উঠুক, নূতন মহৎ শিল্প আর মনকে সরস করতে না থাকুক— তখনকার অবস্থা একবার কল্পনা করুন। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, তখন আমি থাকবো না। কিন্তু মানুষ তো থাকবে। কি অবস্থায় থাকবে? খুব সম্ভব মহৎ শিল্পের স্বাদ সে ভুলে যাবে; রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, কালিদাস, গ্যেটে তার কাছে অপাচ্য লাগবে, কোন এক উৎকট ধরণের থ্রিলার ছাড়া আর কিছুতেই তার অসাড় মনকে নাড়া দিতে সমর্থ হবে না।

এই অনবসর শীতের হাওয়া ইতিমধ্যেই কি বাঙলা সাহিত্যের বনে প্রবেশ করেনি? তার স্পর্শে তরুলতার পুষ্পপল্লব কি ঝ'রে প'ড়ে, অরণ্যের কঙ্কালটা ক্রমে অধিকতর প্রকট ক'রে তুলবে না? বাঙলা সাহিত্যে প্রতি বৎসর কত বই বেরুচ্ছে, সে হিসাব ক'রে লাভ নেই; কারণ, বই এখন ব্যবসার অঙ্গীভূত। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, থ্রিলার—এই পর্যায় যদি স্বীকার করা যায়, তবে সংখ্যার বিচারে থ্রিলার সর্বোচ্চে, গুণের কথা না-ই ধরলাম। কারণ ওখানে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা দেবে; মানুষের জীবনের অসাড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে থ্রিলারের সংখ্যা-বৃদ্ধি কার্যকারণ সূত্রে জড়িত। ইংরিজি বইয়ের বাজারের কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখুন। এ সমস্তের মূলে আছে অবসরহীনতার অভিশাপ। সাহিত্য তথা মহৎ শিল্পসৃষ্টির এইটে প্রথম অন্তরায়। এ সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের যেমন, পৃথিবীর সাহিত্যেও তেমনি—স্বতন্ত্র ক'রে ভেবে লাভ নেই, আজকার দিনে একটিই সমস্যা আছে, জগৎসমস্যা।

৩

বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির দ্বিতীয় অন্তরায় প্রাদেশিকতা।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে আজ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশকে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির ভূতে পেয়ে বসেছে, বাঙলা দেশকেও পেয়েছে। বাঙলা দেশের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ বিস্ময়কর, কারণ গত শতাব্দীতে সর্বভারতীয়ত্ব-বোধের উন্মেষ প্রথমে বাঙলা দেশেই দেখা গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, অন্যান্য অনেক মহৎভাবের মতোই সর্বভারতীয়তা-বোধেরও উদ্ভব রামমোহনের চিত্তে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ভাবনায়কেরা সকলেই এবং পরবর্তী কালের বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ভারতসত্তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সেই উপাদানে তাঁদের রচনা, অভিমত ও জীবন গঠন ক'রে তুলেছিলেন। সেকালের সমস্ত সভাই ছিল ভারত-সভা, সমস্ত সঙ্গীতই ছিল ভারত-সঙ্গীত। নূতন বাঙলা সাহিত্য যে অচিরে পরিণতি লাভ করেছিল তার কারণ সে সাহিত্য ছিল ভারতরসে পুষ্ট, আর সেইজন্যেই অনায়াসে সমস্ত ভারতবর্ষের মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। 'বঙ্গ' কথা তখনো সাহিত্যে প্রবেশলাভ করেনি। আমি অন্য প্রসঙ্গে অনেকবার বলেছি সোনার বাঙলার মায়ামৃগ আরও পরবর্তী কালের ডেপুটি সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। ভারতীয়তাবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই তখনকার বাঙলা সাহিত্য ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও Urbanity-গুণে পৌঁছতে পেরেছিল। এখনকার বাঙলা সাহিত্য বৈদেশিক তত্ত্ব ও বৈদেশিক প্রভাবের যতই বড়াই করুক না কেন, পূর্বতন Urbanity-গুণ তাতে বিরল, বড়জোর তাকে Sub-Urban বলা যেতে পারে।

এমনতরো পরিবর্তনের কারণ কি? কতকগুলো বাহ্য কারণ আছে। যতদিন কল্‌কাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, নানা বিচিত্র পথিকের আনাগোনা তখন এদেশে ছিল। আবার বাঙলা দেশেই ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা প্রথমে ঘটেছিল। এই দুটি বাহ্য কারণ বাঙলা দেশকে স্বভাবতই ভারত-চেতন করে তুলেছিল। তারপরে এক সময়ে রাজধানী কল্‌কাতা থেকে দিল্লীতে অপসারিত হ'ল ; তার কিছু আগে এলো বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। আপনারা জানেন এ দুটো ঘটনার মধ্যে কার্যকারণের একটা সূত্র আছে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে বঙ্গ শব্দটার উপরে অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দেওয়া হ'ল। তখনকার সব জাতীয় সঙ্গীতই বঙ্গসঙ্গীত, আগেকার মতো আর ভারতসঙ্গীত নয়। প্রাকৃত জনের চিত্তে একটা ভাবের অনুপাত-বৈষম্য ঘটে গেল, প্রদেশ দেশের চেয়ে বড় হয়ে উঠল। অবশেষে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হ'ল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারত-ভঙ্গ ঘটে গেল। আমি জানি বাঙলা দেশে এমন শিক্ষিত লোক যথেষ্ট আছেন ভারত কথাটা যাঁদের কাছে নিরর্থক, ভারতীয়তাবোধ তাঁদের বিবমিষা জাগ্রত করে দেয়—বাঙলা দেশ ছাড়া আর কোন সত্তা তাঁরা সহ্য করতে পারেন না ব'লে। অস্তিত্বের গণ্ডীকে একবার ছোট করতে আরম্ভ করলে তার পরিণাম কোন্ অলক্ষ্যপ্রায় বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে কে বল্‌তে পারে? এই প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের জীবনপরিধি সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে, আর তারই সঙ্গে তাল রেখে আমাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। কোন্ বইখানায় কতগুলো তত্ত্ব, কতগুলো বাস্তব বা অবাস্তব 'Ism' আছে, তা দিয়ে বইখানার বিচার চল্‌তে পারে না। বইখানার পিছনে যে লেখক আছেন তাঁর মনের উদারতা, শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা—এইগুলোই হচ্ছে গ্রন্থের আসল পটভূমি। লেখকের মনের গুণ লেখায় সঞ্চারিত হবেই। আজকার দিনের বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ বই লেখকের মনের দীনতার ছাপ বহন করছে। ধার-করা রাজপোশাকে ভিখারি রাজা হয় না, ধার-করা তত্ত্বে, ভাড়া-করা টেকনিকে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভকালের পাঁচালি ও কবিগান যেমন নিতান্ত গ্রাম্য রচনা ছিল—বর্তমান কালে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, গদ্য এবং পদ্য দুই-ই, তাতেও সেই গ্রাম্যতার

লক্ষণ ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিচ্ছে। গ্রামে রচিত রচনাই গ্রাম্য নয়। গ্রামে রচিত অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী সর্বজনগ্রাহ্য। গ্রামে রচিত ময়মনসিংহ-গীতিকার অধিকাংশও সর্বজনগ্রাহ্য। শহরে রচিত হ'লেও সাহিত্যের গ্রাম্য হতে বাধা নেই। সেকালের কবি-গানের অনেক পালাই তৎকালীন কলকাতা শহরে রচিত, তৎসত্ত্বেও সে সমস্তই নিতান্ত গ্রাম্য। একালের কলকাতায় রচিত অধিকাংশ রচনাও গ্রাম্য। কোন কোন আধুনিক কবির কবিতায় Rhythm-এ ছন্দস্পন্দে দাশরথির ছন্দ ধ্বনিত, দাশরথির টেকনিকও স্পষ্টপ্রায়। দুই কবির কবিতা আবৃত্তি ক'রে দেখিয়ে দেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে মনে ক'রেই সে কাজে নিরস্ত থাকলাম। আসল কথা গ্রাম্যতা দোষের সৃষ্টি শহরেও নয়, গ্রামেও নয়, মনের মধ্যে। প্রাদেশিকতা-বোধের সঙ্কীর্ণতর রূপ গ্রাম্যতা দোষ। আমাদের বর্তমান সাহিত্যের গ্রাম্যতাই প্রমাণ করে আমাদের সাহিত্যে প্রাদেশিকতাবোধ কতখানি মজ্জাগত হয়ে পড়েছে—এই অল্প সময়ের মধ্যে। অনেকে বলবেন, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা-বুদ্ধি শুধু বাঙলাদেশকে পেয়ে বসেনি, অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও পেয়ে বসেছে। অবশ্যই. পেয়ে বসেছে। তারাও ভুগবে, কিন্তু তাতে ক'রে আমাদের দুর্ভোগ বাঁচে কি ভাবে? প্রাদেশিক-বুদ্ধি যে সর্বত্র দেখা দিচ্ছে, তার কারণ সর্বভারতীয়তাবোধ সুদৃঢ় বনিযাদ পায়নি, ভিতরে ভিতরে কাঁচা ছিল। ইংরেজ-শাসনের বন্ধন আর ইংরেজ-তাড়ানোর উৎসাহ এই দুই সূত্রে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলো এতকাল গ্রথিত ছিল। এখন ইংরেজ ও ইংরেজ-শাসন দুই-ই অপসৃত। সেই সঙ্গে, যে সূত্রে প্রদেশগুলো বাঁধা ছিল, সেই সূত্রও অপসৃত। অন্তরের যোগে যা যুক্ত হয়নি, বাইরের বাঁধন খুলতেই তা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে গেল। এইতো আমাদের অবস্থা।

প্রাদেশিকতাবোধের রেষারেষি রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রমে উগ্র হয়ে উঠছে। রাজনীতিকরা বলেন, রেষারেষিতেই নাকি রাজনীতির স্বাস্থ্য! হবেও বা! কিন্তু সাহিত্যের স্বাস্থ্য ব'লে যদি কিছু কল্পনা করা যায়, তবে রেষারেষিতে

তা ভঙ্গ হবারই আশঙ্কা। বাঙলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'তে আরম্ভ হয়েছে। —এর প্রতিকারের উপায় কি? উপায় তো আবিষ্কার করতেই হবে; নতুবা বাঙলা সাহিত্যের গ্রাম্যতা দোষের পথ রুদ্ধ হবে কিভাবে? এই হ'ল গিয়ে বাঙলা সাহিত্যের দ্বিতীয় সমস্যা।

৪

বাঙলা-সাহিত্যের তৃতীয়তম, নূতনতম এবং কঠিনতম সমস্যা হ'ল দলীয়তাবাদ। দলীয়তাবাদ কথাটা কানে নূতন ঠেকলেও শব্দটা প্রায় দলাদলির মতোই পুরাতন। বর্তমান যুগের একটা টান আন্তর্জাতিকতা, সর্বজাতিকত্ব প্রতিষ্ঠা তার আদর্শ। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছে ছোটবড় দল-উপদলের ফাটল-ধরানো তত্ত্ব। মানুষ যখন তক্তপোষে শুয়ে সর্বজাতীয়ত্বের স্বপ্ন দেখছে, তখন যে ধীরে ধীরে তার তক্তপোষের কাঠগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর এক মুহূর্ত পরেই সে ধরাশায়ী হবে, তা কি সে ভাবতে পারছে? দলাদলি সব সময়েই ছিল, আর রাজনীতি মানেই বোধ করি দলাদলি, কাজেই দলাদলি তার অস্তিত্বের পুরোনো দলিলখানা দেখিয়ে সমালোচককে নীরব ক'রে দিতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগের রাজনৈতিক দলাদলি আর রাজনীতিমাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, মানুষের সমগ্র জীবনকে সে আক্রমণ করেছে। এমন কি সাহিত্য, শিল্প, ধর্মের মতো সর্বজনীন, সর্বকালীন বস্তুকেও সে নিজের সীমার বহির্গত মনে করে না। বস্তুত সর্বজনীন, সর্বকালীন শাশ্বতকেই সে মানে না। মানলেই যে বিপদ। যখন যেমন সুবিধা, তখন তেমন কর্মপদ্ধতি—এই নীতি অবলম্বন ক'রে যারা দলীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে, কোন-কিছু নিত্য বা ধ্রুব—একথা তারা স্বীকার করবে কেমন ক'রে? তাতে যে দলের ভিত্তিটাই ধ্বসে যায়। ধর্মকে দলীয়তাবাদ অস্বীকার করে না, কেবল নিজের দৃষ্টি দিয়ে তার এমন ব্যাখ্যা করে, যাতে

দলীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা বাড়ে। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিকেও তারা দলীয় ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিয়েছে। অর্থাৎ দলীয় ব্যাখ্যার হাতে প'ড়ে সাহিত্য প্রচারপত্রে ও জর্নালিজমে পরিণত হয়েছে। অবশ্য দলীয়তাবাদ বলে যে, মানুষের কল্যাণই তার কাম্য। কিন্তু মানুষের কল্যাণ কার কাম্য নয়? যে অসভ্য নরখাদক জাতি বংশের বৃদ্ধগণকে বা পরাজিত শত্রুগণকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলে, তারাও মানবকল্যাণের আদর্শ নিয়েই ওই কাজটি করে। কাজেই মানবকল্যাণের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। শিল্পের লক্ষ্য মানুষ, দলীয়তাবাদের লক্ষ্য দলীয় মানুষ; শিল্পের আদর্শ মানুষের প্রতিষ্ঠা, দলীয়তাবাদের আদর্শ দলের প্রতিষ্ঠা; শিল্প শাশ্বত ব'লে একটা নিত্যবস্তু স্বীকার করে, দলীয়তাবাদ বলে মানুষের ইতিহাস মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে—নিত্য কিছু নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিল্প ও দলীয়তাবাদের ভিত্তিই ভিন্ন। তৎসত্ত্বেও যদি দেখতাম যে, দলীয়তাবাদের ফলে কোন মহৎ শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, তবু তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য দল-উপদলগুলো বলবে যে, মহৎ শিল্পের অভাব কি? প্রত্যেক দলই যে মহৎ শিল্প ও শিল্পীর দাবী রাখে। প্রত্যেক দলই বলে যে, আমার দলের বা আমার দলের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন অমুক লেখক—লেখকের সেরা। এই ব'লে দলের প্রচারযন্ত্র সেই লেখকের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লেগে যায়। নিরীহ পাঠকের পক্ষে কতক্ষণ আর মাথা ঠিক রাখা সম্ভব। ক্রমে সে দলের প্রচারকার্যকে স্বীকার ক'রে নেয়; দল ভাবে, যাক্, আর একটি পাঠক পরোক্ষে আমার hegemony বা সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার ক'রে নিল। বিদেশে দলীয়তাবাদ বেশ কায়েম ক'রে বসেছে। সে-দেশের অনেক স্থানেই রাজনৈতিক দল বা গভর্নমেণ্ট জাতির জীবনকে এমনভাবে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে, যাতে শিল্পীরাও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। কালক্রমে শিল্পের স্বাধীনতার নাম পর্যন্ত যখন লোকে বিস্মৃত হবে, তখন ওই পরাধীনতাকেই স্বাধীনতা ব'লে মনে করতে থাকব।

বিদেশের এই ঢেউ এ-দেশে এসে পৌঁচেছে; বাঙলাদেশেও পৌঁচেছে। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক দলের অভাব কোনকালেই ছিল না। কিন্তু তখন তারা শিল্পকে control করবার স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র। এখনকার প্রত্যেক রাজনৈতিক দল মানুষের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে আয়ত্ত করতে চায়। বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্য ও রাজনীতির দিকে তাকালে আমার উক্তির সমর্থন পাবেন ব'লেই বিশ্বাস করি। সার্কাসের দল যেমন সগর্বে ঘোষণা করে যে, তার দলে ক'টা রয়াল বেঙ্গল টাইগার, হাতী, ভাল্লুক প্রভৃতি আছে, আর তাই দিয়েই তার কৌলীন্যের বিচার হয়, রাজনৈতিক দলগুলোও তেমনি ঘোষণা করে যে, তার দলে কোন্ সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি আছেন।

একক সাধনার যুগ বর্তমান কাল নয়। দল পাকিয়ে শক্তিমান হওয়া এ-কালের লক্ষণ। দলের হাতেই ধন-মানের দক্ষিণা থাকাতে সাহিত্যিকগণও একে একে এ-দলে ও দলে ভিড়ে পড়ছেন। যাঁরা এখনো দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা দেখছেন, যেখানে হরিরলুঠের বাতাসা ভাগ হচ্ছে, সেখানে তাঁদের স্থান নেই, তাঁদের কেউ বড় গ্রাহ্য করছে না। তখন তাঁরাও হয়তো দলীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এই প্রক্রিয়া বাঙলাদেশে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের মূল আদর্শ বিস্মৃত হয়ে গিয়ে শিল্পীরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘকালস্থায়ী পরাধীনতার মধ্যেও বাঙলাদেশ তার সাহিত্যের জানালাটা খুলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, তাতেই সমস্ত দেশ বেঁচে গিয়েছে। আজ দেখছি, সেই জানালা বন্ধ করবার ষড়যন্ত্র চলছে। মানুষ যে বৃহৎ পৃথিবীর বাতাসকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে দলীয়তাবাদ তা সহ্য করতে পারে না, তার নিজস্ব Oxygen Cylinderএর বাষ্পের পরিমাপিত নিঃশ্বাস মানুষ গ্রহণ করুক, প্রত্যেক প্রশ্বাসে তার জয়ধ্বনি নিঃসৃত হোক—এই তার কাম্য।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ রাষ্ট্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করবার ফলেই আণবিক

বোমার ন্যায় সর্বনাশের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে—এখন শিল্পীরা যদি দল বা রাষ্ট্রের নিকটে আত্মসমর্পণ ক'রে বসে, তবেই চমৎকার। যুদ্ধকালীন অবস্থায় প'ড়ে অনেক রকম কন্‌ট্রোলই দেখলাম, এখন শিল্পের কন্‌ট্রোল দেখা বাকি আছে। এই ব্যাপারও শীঘ্রই স্বচক্ষে দেখতে হবে, কিংবা আংশিকভাবে দেখেছি বলাই উচিত। শিল্পের বন্ধনের আশঙ্কা সর্বত্র দেখা দিয়েছে—বাঙলা-সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে। এইটি বাঙলা-সাহিত্যের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কারণ। যক্ষপুরীর মতো স্থানেও নন্দিনীকে কেউ বাঁধতে পারেনি। আর এখানে নন্দিনীকে নাচওয়ালীর দলে ভিড়িয়ে সর্দারদের বাগানবাড়িতে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলছে। এ-দৃশ্যও কি রঞ্জনকে দেখতে হবে? মানুষ মাত্রেই রঞ্জন। যক্ষপুরীর রঞ্জনের সৌভাগ্য যে, সে ম'রে বেঁচেছিল। আমাদের রঞ্জনকে বেঁচে মরতে হবে, তাকে দেখতে হবে যে, তার প্রেয়সী শিল্পকলা নন্দিনী পেশোয়াজ প'রে সর্দারের যষ্টি-শাসনের তালে তালে দলীয়তাবাদের জয়ধ্বনি পায়ের ঘুঙুরে বাজিয়ে আসর মাত করছে! এই শোচনীয় কাণ্ড যাতে না ঘটতে পারে, শিল্পী ও শিল্পরসিকদের এখনই সে বিষয়ে অবহিত হয়ে ওঠা আবশ্যক।

৫

এই তো আমাদের অবস্থা। এখন কর্তব্য কি? প্রতিকারের উপায় কি? জানি না। আর ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি যে, মানুষে কখনো দেখে শেখে না, ঠেকে শেখাই তার অভ্যাস। কোন একটা দুর্গতি চরম পর্যন্ত না গিয়ে থামে না। বাঙলা সাহিত্যের দুর্গতিও চরম পর্যন্ত যাবে, আর সেজন্যেই আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো। তবে সাধারণভাবে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, মন আমাদের এখনো পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন পশ্চিম দিক থেকে নিজের দিকে মুখ ফেরাবার সময় এসেছে—তারই আর-এক নাম আত্মস্থ

হওয়া। পশ্চিম এক সময়ে আমাদের নবজাগরণে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ পশ্চিম আমাদের মনের খাদ্য জোগাতে পারবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়। বরঞ্চ দেখছি অনেক বিদেশী শক্তিমান লেখক ভারতের উপনিষদে ও যোগশাস্ত্রে জীবনের পাথেয় সন্ধান করতে আরম্ভ করেছেন। বিদেশ থেকে এখন আমরা একটা Steam engine বা ওইজাতীয় দু'একটা যন্ত্রপাতি নিতে পারি; কিন্তু তার বেশি পাশ্চাত্যদেশ আর কিছু আজ আমাদের জোগাতে অক্ষম। যে-দেশের মাটিতে এখনো গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব, মনে রাখতে হবে তার সম্ভাবনার অন্ত নেই। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের জন্মের ফলে ভারতবর্ষ সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিক উত্তমর্ণে পরিণত হয়েছে। এ দেশের সাহিতিাক, শিল্পী যখন কাঙালের বেশে ইউরোপের কাছে হাত পাতে তখন লজ্জা অধিক হয়, কি দুঃখ অধিক হয় বলা কঠিন। তখন বুঝতে পারি, শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি থেকে এরা বঞ্চিত, নতুবা ঘরের সম্পদের সন্ধান জানবে না কেন? উনবিংশ শতকের অধমর্ণ ভারত আজ উত্তমর্ণে পরিণত, এই সত্যটা এখনো আমাদের বুঝতে বাকি আছে।

বাঙালী সাহিত্যিকগণ যদি কিছু সংস্কৃত শেখেন, তবে তাঁদের আত্মস্থ হবার সাহায্য হবে, তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দূরকালের দিকে প্রসারিত হবার সুযোগ পাবে। আর সেই সঙ্গে তাঁরা যদি কিছু হিন্দী শেখেন তবে তাঁদের দৃষ্টি বিপুল ভারতবর্ষের দিকে আপনি বিস্তারিত হয়ে যাবে। সংস্কৃত এবং হিন্দি দেশে কালে বিস্তৃত ভারতীয় জীবনকে জানতে সাহায্য করবে।

বর্তমান জটিল জীবনের জালখানার অন্তরালে যক্ষপুরীর মানবরাজ মুক্তির জন্য আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এখন কে তাকে মুক্তির পথ দেখাবে? এই যক্ষ পুরীতে আছে এক নন্দিনী, সে তার খোঁপায় নীলকণ্ঠ পাখির পালক গুঁজে প্রস্তুত। শিল্পলক্ষ্মীই মানুষকে বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দিতে পারে; কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় লক্ষণ এই যে, মানুষ আজ তাকেও বাঁধবার ষড়যন্ত্র করতে উদ্যত। অদৃষ্ট যখন বিরূপ হয়, তখন কারাগারের রক্ষীকেই মুক্তিদাতা ব'লে

মনে হয়, আর মুক্তিদাতাকে বাঁধবার ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। মানবসমাজে সেই ইচ্ছা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে, সর্বনাশ চরমে পৌঁছবার আগেই যক্ষপুরী থেকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, শিল্পলক্ষ্মী নন্দিনী এই বিপ্লবের সহচরী, খোঁপায় তার নীল আকাশের আশীর্বাদের মতো নীলকণ্ঠ পাখির পালক, মণিবন্ধে তার অনুরাগের রঙে দীপ্ত রক্তকরবীর গুচ্ছ! শিল্প ও মানুষ একসঙ্গে বাঁচবে, কিংবা এক সর্বনাশের তলে তলিয়ে যাবে সেই পরীক্ষার পরম মুহূর্ত আজ সমাগত। তাই আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একবার ব'লে নিই—জয় হোক নন্দিনীর জয় হোক। *

* জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় পঠিত অভিভাষণ

জর্নালিজম্ ও সাহিত্য

জর্নালিজম্ কি বুঝি, সাহিত্য কি তাহাও বুঝি, কিন্তু এ দুইয়ে প্রভেদটা কোথায় সহজে বুঝিতে পারি না। অনুমানে বুঝি একটা প্রভেদ কোথাও আছে—কিন্তু কোথায়? এবং কিসে? কোন্ গুণের তারতম্যে সাহিত্য জর্নালিজম্ হইয়া পড়ে, কিংবা কোন্ গুণের সঞ্চার হইলে জর্নালিজম্ সাহিত্য হইয়া ওঠে? রসিক ব্যক্তি বলিতে পারেন, না ভাবিয়া লিখিলে জর্নালিজম্, ভাবিয়া লিখিলে সাহিত্য। কিন্তু তাই কি? তবে জর্নালিজম্ অনেক সময়ে এত গুরুভার কেন? সাহিত্যই বা অনেক সময়ে এমন অন্তঃসারশূন্য কেন? কাজেই প্রভেদের এই সংজ্ঞাকে মানিয়া লওয়া যায় না। জর্নালিজম্ ও সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ বিচার করিয়া তাহাদের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপূর্বে জর্নালিজম্ ও সাহিত্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধটি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বর্তমান কাল জর্নালিজমের যুগ। রচনার রাজপথে জর্নালিজম্ ও সাহিত্য যুগল-পথিক। রচনার আদিমকাল হইতে পথিকদ্বয় পথে চলিতেছে। কিন্তু আজকাল জর্নালিজমের যে গৌরব, যে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান ও আত্মাভিমান এমন কোন কালে ছিল না। যে জর্নালিজম্ সাহিত্যের তল্পীবাহক ছিল, আজ সে সাহিত্যের স্কন্ধে আপনার পুরাতন গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটি তুলিয়া দিয়াছে। এ যুগ তো বাহক-পরিবর্তনের লক্ষণাক্রান্ত; জমিদারের পাইক এখন জমিদারের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী, কারখানার মালিক কারখানার মজুরদের অনুগ্রহপ্রার্থী। নিতান্ত পূর্বজন্মের দুষ্কৃতি না থাকিলে এ যুগে কেহ মালিক বা মনিব হয় না। আমরা লক্ষণের বিচার করিতে বসিয়া এ সব বলিতে বাধ্য হইতেছি, কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত

বলা আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয় [অবশ্য প্রয়োজন হইলে (এবং না হইলে)—তাহাও বলিতে পারি]। যুগধর্মের নিয়মানুসারে সাহিত্য ও জর্নালিজমেরও গুরুত্বে তারতম্য ঘটিয়া গিয়াছে। বৈশ্য জর্নালিজম্ সাহিত্য-ব্রাহ্মণের আসর জবর-দখল করিয়া উপবীত ধারণ করিয়াছে। আবার সাহিত্যও নিজের নাম ও জাতি ভাঁড়াইয়া জর্নালিজমের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—অনেক সময়েই চিনিবার উপায় নাই। এ দুইয়ের বর্ণবিনিময় এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। পূর্বে এমন ছিল না, যদিচ জর্নালিজম্ সব কালেই ছিল। জর্নালিজম্ যে কেবল সর্বকালে ছিল এমন নয়, রচনার সর্ব শাখায় ছিল—এখনো আছে।

মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সর্ব শাখাতেই জর্নালিজম্ ও সাহিত্য দুই শ্রেণীর রচনাই আছে। পোলিটিকাল জর্নালিজম্ মূল জর্নালিজমের একাংশ এবং ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। কয়েকটি উদাহরণ লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

হোমারের মহাকাব্যদ্বয় যদি হয় সাহিত্য, তবে হেসিয়ডের (Hesiod) 'Works and Days' জর্নাজিলম্ ছাড়া আর কিছুই নয়। চশারের কাব্য সাহিত্য, Langland-এর 'The Vision of Piers the Plouman' জর্নালিজম্। শেক্সপীয়রের নাটক সাহিত্য, আর তাঁহার সমকালীন 'University Wits' বলিয়া কথিত নাট্যকারগণের (Marlowe বাদে) অধিকাংশ রচনাই জর্নালিজম্। আমাদের দেশে বেদের কর্মকাণ্ড জর্নালিজম্, জ্ঞানকাণ্ড সাহিত্য। কালিদাসের কাব্য যদি সাহিত্য হয়, ভট্টিকাব্যম্ জর্নালিজমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়, শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ও পথের দাবী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম জর্নালিজমের কান ঘেঁষিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালী সাহিত্য, আর আধুনিক বামপন্থী লেখকগণের অধিকাংশ রচনা জর্নালিজম্। (কত নাম করিব—

স্থানাভাব!) ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য, কিন্তু রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর জর্নালিজম্ ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যিক বিচারে পরমোৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিলেই যে কোন রচনাকে জর্নালিজম্ বলিতে হইবে এমন নয়। ইংরাজি সাহিত্যে যে সব নাটককে Restoration Comedy বলা হয়, সেগুলি চতুর রচনার দৃষ্টান্ত হইলেও অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য নয়। অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকগুলিও সুচতুর রচনার দৃষ্টান্ত—অত্যুচ্চ শ্রেণীর নাটকের নহে। কিন্তু যেহেতু এসব অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর রচনা—তাই বলিয়াই এগুলিকে জর্নালিজম্ মনে করিলে ভুল হইবে। এগুলি সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্নালিজমের বিশেষ লক্ষণ এ সবে নাই। এ সমস্ত নাটক নিজের রচিত কৃত্রিম সংস্কার ও আবহাওয়ার মধ্যে বিধৃত। তৎসত্ত্বেও এগুলি আজিও যে উপভোগ্য তাহার কারণ এসব কৃত্রিম। গাছের ফুল দুদিন বাদে ঝরিয়া মরিয়া যায়, কাগজের কৃত্রিম ফুলের দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে বাধা নাই।

আবার জর্নালিজম্ হইলেই যে দু'দিন বাদে নষ্ট হইয়া যাইবে এমন নয়। ভল্টেয়ার যে-সব রচনাকে জর্নালিজম্ মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন আজ সেই দুয়োরাণীর সন্তানগুলিই তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার Candide ও তজ্জাতীয় রচনা জর্নালিজম্। আর যে-সব কাব্য ও নাটকের জন্য তৎকালীন লোকে তাঁহাকে হোমারের চেয়ে বড়, কর্নেই রাসিনের চেয়ে (সে যুগের ফরাসী সাহিত্যবিচারক শেক্সপীয়রকে মহৎ বা major লেখক মনে করিত না) শ্রেষ্ঠতর মনে করিত, সে-সব রচনা আজ কে পাঠ করে?

কাজেই দেখা গেল, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর রচনা হইলেই যে জর্নালিজম্ হইবে এমন নয়, বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেই যে জর্নালিজম্ হইবে এমন নয়, কিংবা লিখিত হইয়া যথাকালে বিস্মৃত হইয়া গেলেই যে জর্নালিজম্ হইবে—এমনও নয়। তবে জর্নালিজমের বিশেষ লক্ষণ কি? সাহিত্যের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোন্ গুণে?

২

জর্নালিজমের বিশিষ্ট লক্ষণ সমাজ-চৈতন্য, সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ জীবন চৈতন্য। জর্নালিজমে সমাজ-চৈতন্য থাকিলেই যথেষ্ট, জীবন-চৈতন্য থাকিতে পারে, না থাকিলেও ক্ষতি নাই। সাহিত্যে জীবন-চৈতন্য অবশ্যই থাকিবে, সমাজ-চৈতন্য থাকিলেও ক্ষতি নাই। বিশেষ দেশ ও কালে লিখিত বলিয়া সাহিত্যে সমাজচৈতন্য অনেক সময়ে থাকিয়া যায়—সাহিত্যিকও সামাজিক জীব বলিয়া অনেক সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারেই থাকিয়া যায়, কিন্তু ওইখানেই তাহার থামিয়া গেলে চলিবে না; রচনা সাহিত্য-পদ-বাচ্য হইতে গেলে রচনাকে জীবন-চৈতন্য পর্যন্ত উন্নীত করিতে হইবে। জর্নালিজমের আরও অনেক গৌণ গুণ থাকিতে পারে—প্রায়শ থাকিয়া যায়, কিন্তু সমাজ-চৈতন্য না থাকিলে রচনাকে অন্য কোন পর্যায়ে ফেলিতে হইবে, জর্নালিজম বলা চলিবে না। জর্নালিজম বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লিখিত হইতে পারে, সাময়িক ঘটনার চাপে লিখিত হইতে পারে, কিন্তু যে-কারণেই হোক, যে-সমাজে তাহার উদ্ভব তাহার আবহাওয়াকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাহিত্য ও জর্নালিজমে বাহিরের দিক হইতে বিশেষ পার্থক্য নাই—কারণ সাহিত্যও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বা সাময়িক ঘটনার চাপে লিখিত হইতে বাধা নাই, বরঞ্চ অনেক সময়েই পূর্বোক্ত কারণে বা ভাবে লিখিত হইয়া থাকে—প্রভেদটা প্রক্রিয়ায় নহে, পরিণামে।

কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের সমকালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সরাসরি পোলিটিকাল জর্নালিজম ছাড়া আর কিছুই নয়। এতকাল পরেও সেগুলি সুপাঠ্য এবং আজিকার দিনেও গ্রহণ করা যাইতে পারে এমন অনেক বস্তু এই সব রচনায় আছে,—অথচ তৎকালীন সংবাদপত্রের 'জর্নালিজম'-গুলি আজ কোথায়? এই প্রভেদের একটা কারণ অবশ্য, নিছক রচনার শিল্পকৌশলে

রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। কিন্তু ইহা একটা মাত্র কারণ, একমাত্র কারণ নহে। আসল কারণ, সংবাদপত্রের লেখক রচনায় সমাজচেতনার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হইয়া জীবন-চৈতন্যে পৌছিয়াছেন। এই জীবন-চৈতন্যই তাঁহার জর্নালিজমকে আজিও সুপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা নিছক রচনা বা স্টাইলের উৎকর্ষ কোন গ্রন্থকে দীর্ঘকাল জীয়াইয়া রাখিতে পারে না। যে গুণে রচনা অমর হয় তাহার নাম জীবন-চৈতন্য। যে রচনায় এই গুণ প্রচুর পরিমাণে আছে তাহার আয়ুষ্কাল স্বভাবতই দীর্ঘ। সমাজ-চৈতন্য রচনাকে কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারে—কিন্তু সমাজের পরিবর্তন হইলেই সেই রচনার ভিত্তি ভাঙিয়া পড়ে।

বার্নার্ড শ' ও চেস্টারটনের অনেক রচনা মূলত জর্নালিজম, কিন্তু জীবন-চৈতন্যের রস বহুল পরিমাণে তাহাতে আছে বলিয়া সেগুলি সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইয়া এখনও সর্বজনপাঠ্য হইয়া আছে।

শেক্সপীয়রের 'Merry Wives of Windsor' নাটকের জর্নালিজম। বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ফলস্টাফ প্রেমে পড়িলে কিরূপ আচরণ করে রাণী এলিজাবেথের তাহা দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায় রাণীর অনুজ্ঞাক্রমে নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল। মূলপ্রেরণার বিচারে নাটকখানি বহুকাল বিস্মৃত হইবার কথা। কিন্তু চতুর কবি রাণীর ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া অনেক পরিমাণে জীবন-চৈতন্য বা জীবনরস ইহাতে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

আবার বিপরীত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। হোমারের মহাকাব্য দুইখানি ঘনীভূত সাহিত্য। কিন্তু তাহাতেও সমাজ-চৈতন্যের যথেষ্ট চিহ্ন আছে। রাজকুমারী নসিকা সখী-সহচারিণী হইয়া সমুদ্রতীরে কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। এই তথ্যটি সমাজ-চৈতন্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৎকালে ও তৎসমাজে রাজকুমারীদের পক্ষেও প্রকাশ্যে কাপড় কাচা যে সামাজিক বিধি-

বহির্ভূত ছিল না—এই ঘটনাটি তাহারই প্রমাণ। ইহা বিশেষ-এক কালের, বিশেষ-এক দেশের—অর্থাৎ বিশেষ-এক সমাজের লক্ষণ। আধুনিক কোন রাজকুমারীর পক্ষে এমন কাজের কল্পনাও অসম্ভব। এমন সমাজ-চৈতন্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত হোমারের কাব্যদ্বয়ে আছে। তিনি যদি Hesiod মাত্র হইতেন, তবে সমাজ-চৈতন্যে আরম্ভ করিয়া সমাজ-চৈতন্যেই শেষ করিতেন, ইউরোপের কবিগুরু হইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, কবির মূলধন জীবন-চৈতন্য।

"So said she ; they long since in Earth's
soft arms were reposing,'
There, in their own dear land, their
fatherland, Lacedaemon"

কিংবা—

'Nay, and thou too, old man,
in former days wast, as we hear,
happy'.

উদ্ধৃত দুটি অংশে যে-রস তাহা তৎকাল বা তৎস্থান অর্থাৎ সমাজের কোন বিশেষ অবস্থার উপরে নির্ভরশীল নহে। ইহাদের অন্তর্নিহিত বেদনা সমগ্র মানবসমাজের অন্তর্গত, হোমারের গ্রীক-সমাজের মাত্র নয়। এই রসকেই আমরা জীবন-রস বলিতেছি, এই রস সম্বন্ধে সচেতনতাকেই জীবন-চৈতন্য বলিতেছি। এই রসই হোমারের কাব্যের মূলধন। অন্যরস অর্থাৎ সমাজ-চৈতন্য আনুষঙ্গিকভাবে মাত্র আছে। কবি ও মহাকবিতে প্রভেদ জীবনরসের তারতম্যে। অ-কবি ইহার সন্ধান জানে না। সে নাম ভাঁড়াইয়া সমাজ-চৈতন্য চালায়—বলে, এইটাই ইউরোপের আমদানি আধুনিকতম রসায়ন।

৩

সমাজ-চৈতন্যের উপরে নির্ভর করিয়া স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়, কেননা সমাজ-চৈতন্য বস্তুটাই অস্থায়ী। দেশে দেশে সমাজ-ভেদ, কালে কালে

সমাজ-ভেদ। সমাজ-চৈতন্যও দেশ ও কালের ভেদে ভিন্ন। আবার এক দেশেই কি সমাজ চিরদিন এক রকম থাকে? আজিকার সমাজ কালিকার সমাজ নয়। আজিকার সমাজ-চৈতন্য কালিকার হইতে ভিন্ন। এমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া চলা আর পুরাতন পঞ্জিকা দেখিয়া তিথিনির্ণয় কি একজাতীয় প্রচেষ্টা নয়? জর্নালিজমের পক্ষে সমাজ-চৈতন্যই যথেষ্ট, কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সর্বনাশ! তবে যেহেতু সাহিত্যিকের সামাজিক সত্তা আছে, তাহার রচিত সাহিত্যেও সামাজিক সংজ্ঞা অর্থাৎ সমাজ-চৈতন্য থাকিবে, থাকাই শ্রেয়। কিন্তু সাহিত্যিক নিজ স্বভাবের প্রেরণায় সমাজ-চৈতন্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, যে পরিমাণে হয় সেই পরিমাণে তাহার রচনা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। আবার উদাহরণ লওয়া যাক্।

রবীন্দ্রনাথের গোরা। এ বইখানি সমাজের যে অবস্থায় লিখিত তাহার চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান। শুধু গ্রন্থখানির লিখন-কালের সামাজিক চিহ্ন নয়, গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা-কালের লক্ষণও ইহাতে অবিরল।—(১) ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্যোগে আমাদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা হইয়াছে। ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে নানারূপ সমস্যা দেখা দিতেছে। (২) ইংরাজি সাহিত্য ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিক্রিয়ায় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগিতেছে। ইহারই অনুক্রম রূপে হিন্দু আদর্শে ও ভারতীয়তার আদর্শে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বর্ণিত ঘটনার কাল কন্‌গ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী—এমন কি আনন্দমঠ-রচনারও পূর্ববর্তী বলিলেই চলে। গোরার জন্ম সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে। ঘটনাকালে তাহার বয়স বোধ করি পঁচিশ বৎসরের অধিক নয়। বিনয়ের কিছু কম হওয়াই সম্ভব। অতএব ১৮৫৭+২৫=১৮৮২ সাল পাই। কিন্তু যে সমাজ-চৈতন্য গ্রন্থে দেখি তাহা নিছক ওই সময়কার নহে। স্বদেশী আন্দোলনের আঘাতই ইহার প্রাথমিক প্রেরণা, আর কল্পিত সামাজিক কাঠামোর প্রেরণা দ্বিতীয় স্থানীয়। ইহাকে মিশ্র সমাজ-চৈতন্য বলা যাইতে

পারে। প্রধানত ১ম ও ২য় তত্ত্বের সাহায্যেই ইহার গল্প-জাল বোনা হইয়াছে। এই দুটি তত্ত্ব সমাজ-চৈতন্য।

এখন প্রথম তত্ত্ব বা ভাবধারার সমাধান আমাদের সমাজে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার নীতি সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আমাদের জীবনে এখন আর ইহা সজীব, সক্রিয় আকর্ষণ নয়, স্বীকৃত সমাধান। ঐতিহাসিক বস্তুর যেটুকু গুরুত্ব, এখন ইহার কেবল সেইটুকুই আছে। পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই সমস্যা লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিত, আজ আর তাহা করে না। অর্থাৎ সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজচৈতন্যের এই অংশটি মৃত। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, 'গোরা'-রচনার সমকালীন পাঠক এই উপন্যাসখানি পড়িয়া সমাজ-চৈতন্যোদ্ভূত যে অতিরিক্ত রস পাইত, আমরা আজ আর তাহা পাই না।

গোরা গ্রন্থের দ্বিতীয় নম্বর সমাজ-চৈতন্য হইতেছে, হিন্দু আদর্শ ও ভারতীয় আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ইহার মধ্যে আবার দুইটি ভাগ। এদেশ যে আমার অর্থাৎ এই দেশাত্মবোধের সমাধান অনেক কাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশ হিন্দুর না ভারতীয়ের—ভারতীয় বলিতে ঠিক কি বুঝায়—এ সমস্যার সমাধান আজিও হয় নাই। এ সমস্যাটি এখনো জীবন্ত সমস্যা। বরঞ্চ আজকাল ভারতবর্ষে এই দুই আদর্শের টানাটানিতে সমুদ্রমন্থন চলিতেছে, ক্ষণে সুধা, ক্ষণে গরল উঠিতেছে। সমাধান কোন্ পথে আসিবে কেহ জানে না, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই গোরার গুরুত্ব আজ চক্ষুষ্মান্ পাঠকের কাছে ধরা পড়িবার কথা। এই দ্বন্দ্বটি আজ সজীব সমাজ-চৈতন্য, পূর্বোক্তটির মতো মৃত নয়। কিন্তু একদিন ইহারও সমাধান হইয়া যাইবে। তখন এটিও মৃত জ্যোতিষ্কের দলভুক্ত হইবে। তখনকার পাঠক আজিকার পাঠকের আস্বাদিত অতিরিক্ত রসটুকু পাইবে না। সে তখন যাহা পাইতে পারে তাহা নিছক সাহিত্য-রস, জীবন-চৈতন্য হইতে যাহার সৃষ্টি। তখনও যদি গোরা সাধারণ পাঠকের পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকে, তবে কোন

সমাজ-চৈতন্যের ভরসায় থাকিবে না, জীবন-চৈতন্যের জন্যই থাকিবে। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চরিত্রসৃষ্টিতে চিরকালের গ্রহণীয় রস যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে তাহা সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণে চির-কালের পাঠকের মনোযোগ সে লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আর যদি এ:নই হয় যে, সমাজ-চৈতন্যের দীপ দুইটি নির্বাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গৃহটি অন্ধকার হইয়া গেল—পরিত্যক্ত দেউলে আর কেহ গেল না, তবে বুঝিতে হইবে, জীবন-চৈতন্যের অভাবেই এমন ঘটিল। বিশেষ মতবাদকে অবলম্বন করিয়া গল্পরচনায় এইতো বিপদ। মতবাদ একপ্রকার সমাজ-চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নয়, মতবাদ পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম কিনা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহার বিনাশের আশঙ্কা নাই। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী কতকাংশে জীর্ণ হইতে পারে, হইয়াছেও বটে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা চির-নবীন। এমন বিশুদ্ধ জীবন-চৈতন্যের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র অপর কোন উপন্যাস রচনা করেন নাই।

৪

প্রবন্ধের প্রারম্ভে জর্নালিজম ও সাহিত্যের পর্যায়ে যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, এবারে তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের তুলনায় কর্মকাণ্ড জর্নালিজম্। যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কর্মাদির পদ্ধতির আলোচনা ও নির্দেশ কর্মকাণ্ডর উদ্দেশ্য। আজ সে-সবের মূল্য নিতান্ত ঐতিহাসিক মাত্র। জীবনের সহিত তাহাদের সজীব যোগ আজ খণ্ডিত; যে সমাজ-চৈতন্য ছিল তাহাদের ভিত্তি—সেই সমাজ বহুকাল অপসারিত। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষদাদির মূল্য আজও অব্যাহত, কারণ জীবন-চৈতন্য তাহাদের মূল। Hesiod-এর কাব্য গ্রীক-জীবনের তৎকালীন সংস্কার ও বিশ্বাসকে

অবলম্বন করিয়া গঠিত, কাজেই সেই তৎকালীনতা আমাদের এতৎকালীনতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

Langland তাঁহার Vision of Piers the Plouman-এ জগতের যে আদর্শকে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, আজ তাহার মূল্য কি? অথচ চশার-কৃত কেণ্টারবেরির তীর্থযাত্রীদের কাহিনী, মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়াই আজিও রসদানে সক্ষম। সমাজের চেয়ে মানুষ বড়। সমাজ মানুষের নির্মোক মাত্র। এই সত্যটাই মানুষে আজ ভুলিতে বসিয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জর্নালিজম ও সাহিত্য নামান্তরে ও রূপান্তরে আদিম কাল হইতে আছে—কিন্তু এ দুইয়ের সংমিশ্রণ বর্তমান কালে যেমন ঘটিয়াছে, কখনো তেমন ঘটে নাই। আর শুধু সংমিশ্রণই বা কেন, জর্নালিজমকেই যথার্থ সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবার একটা দুর্বুদ্ধি মানব-সমাজে দেখা দিয়াছে। মানুষের সংস্কৃতির পক্ষে ইহা একটা চরম দুর্লক্ষণ।

কেমন এমন হইল? বর্তমান যুগ চিন্তার অরাজকতার যুগ—সত্য-মিথ্যা, শুভাশুভ, ভালো-মন্দে কেমন যেন তাল-গোল পাকাইয়া গিয়াছে। ইহার মূলে আছে গণতন্ত্রের স্থূল হস্তাবলেপ। চিন্তার এই গোধূলি-লগ্নে সমস্ত কেমন যেন আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট। ইহা মধ্যযুগের শাশ্বত নক্ষত্রোজ্জ্বল রহস্যময় অন্ধকারও নয়, আবার অষ্টাদশ শতকের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ভাস্বর দিবা দ্বিপ্রহরও নয়। এমন সময়ে এককে আর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সহজ।

বিশেষ, এযুগে সাহিত্য রাজনীতির বাহন হইয়া পড়িয়াছে, সাহিত্যিকগণ আর 'uncrowned king' নহে, তাহারা 'honorary clerk' মাত্র, বিনা বেতনের কেরানী! রাজনীতিকদের অনুজ্ঞা ও অনুরোধে কলম চালিত হয়। দলীয়তাবোধের চেয়ে বৃহত্তর কোন আদর্শ তাহাদের সম্মুখে নাই—সমস্ত সুনিপুণ হস্তে অপসারিত হইয়াছে। রাষ্ট্র-চৈতন্যের বিবর্তন অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, মধ্যযুগের মানবতন্ত্র ক্রমে গঠনতন্ত্র অতিক্রম করিয়া দলতন্ত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন এই দলতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করিবার জন্যই

সাহিত্যিকদের আহ্বান। মানব-বাদ বা জীবন-চৈতন্য দলতন্ত্রের পুষ্টির অনুকূল নহে।

সার্বজনীন মানুষ আর দলগত মানুষে মূলগত ভেদ আছে। দলগত মানুষ নিতান্তই তৎস্থানিক ও তৎকালিক, অর্থাৎ সে বিশেষ-সমাজের অন্তর্গত সামাজিক জীব মাত্র—তদতিরিক্ত আর কোন সত্তা তাহার নাই। কাজেই মানববাদ বা জীবন-চৈতন্য তাহার পক্ষে শুধু অবাস্তব নয়—ক্ষতিকর; কারণ, বৃহৎ মানুষের কথা বলিতে গেলে তাহার মনোযোগ অবাঞ্ছিত দিকে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা। তাই সাহিত্যের আজ এই দুর্গতি।

এ ঢেউ উঠিয়াছে ইউরোপ হইতে, আসিয়া পৌঁছিয়াছে আমাদের দেশে। ইহার মূলে আছে দলগত রাজনীতির ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতজ্ঞ সাহিত্যিকদেরই আজ সম্মান ও অর্থ; কারণ, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতকারিগণই প্রকাশ্যে সাহিত্যবোদ্ধা হইয়া আসরে অবতীর্ণ হন, এবং এতদিনে যথার্থ সাহিত্য রচিত হইতেছে বলিয়া সার্থক প্রশংসা বিতরণ করেন। এক হাতে আদেশ, অপর হাতে তাহা পালনের পুরস্কার। এ মজা মন্দ নয়। অধিকাংশ দর্শকেই দুই হাতের অপরিহার্য যোগটা বুঝিতে পারে না, কাজেই ভ্রান্তি-বিলাসের রহস্য তাহাদের অনবগত থাকিয়াই যায়। ইহার ফলে, মানুষের সাহিত্যিক আদর্শ যে শুধু খাটো হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাই নয়, মানবত্বের আদর্শও ক্ষুণ্ণ হইতে সুরু করিয়াছে। জীবন-চৈতন্যবাদের আদর্শ-মানব ছিল 'রামচন্দ্র,' সমাজ-চৈতন্য-বাদের হাতে পড়িয়া সে 'আরামচন্দ্রে' পরিণত হইয়াছে। কায়িক আরামের চেয়ে মহত্তর কোন আদর্শ আধুনিক সাহিত্যের সম্মুখে নাই। একবার ক্ষুদ্রতর আদর্শকে গ্রহণ করিলে কোথায় তাহার শেষ কে বলিতে পারে? বৃত্তকে ক্রমে ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলাই তাহার ধর্ম। বাঙলাসাহিত্য আজ ক্ষুদ্রায়মানতার আবর্তে পড়িয়া গিয়াছে। সমাজ-চৈতন্যের আদর্শে যে-সাহিত্যের সৃষ্টি—ব্যক্তিগত জমাখরচের হিসাবই তাহার স্বাভাবিক পরিণাম। দলগত কেরানী-গিরি যে-সাহিত্যিকের আদর্শ, ব্যক্তিগত নকলনবিশীতে তাহার অবসান।

কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃতি এই যে—কোন একটা ঝোঁক মানবসমাজে দেখা দিলে তাহা চরমে না গিয়া থামে না। মধ্য-যুগের আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবাদ হইয়া দলীয়তাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যদি এখনও চরম না হইয়া থাকে তবে আরও অগ্রসর হইবে। রেনেসাঁসের সর্বেন্দ্রিয়মুক্তির উদার চৈতন্য আজ ক্ষুদ্র সমাজ-চৈতন্যে উপনীত। এই প্রক্রিয়ার এইখানেই যে চরম তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সেই চরমের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকাই হয়তো প্রজ্ঞার পরিচয়। মানব-ইতিহাসের দোলদণ্ড দুই চরমে আহত হইতে হইতে চলে। সেই তো মহৎ সান্ত্বনা! চরম যতই নিকটতর হইবে, মুক্তি ততই অধিকতর আসন্ন।

গণ-সাহিত্য

গত কয়েক বৎসর হইল বাঙলা সাহিত্যে গণ-সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে তাহা গণ-সাহিত্য হওয়া দূরে থাকুক, গণ্য সাহিত্যও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে বিশ্লেষ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহার প্রধান উপজীব্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দেশের সাম্প্রতিক দুর্ভোগ ও দুর্ভিক্ষ, কিংবা জনগণের কাল্পনিক দুঃখ-দুর্দশা। উপজীব্যের আলোচনায় ও বিচারে যদি কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, লেখকদের কল্পিত বা পরিকল্পিত দুঃখদুর্দশা ও পাত্রপাত্রীই গণ-সাহিত্যের স্বরূপ, তবে তাহাকে অবিচারে দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুত, গণ-সাহিত্য কি বস্তু সে বিষয়ে লেখকদের মনেই যেন সন্দেহ আছে, তাই পাঠকদের সন্দেহের নিরসন হইতে চায় না। তাঁহাদের রচনা পড়িয়া গণ-সাহিত্য কি বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই গণ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়, মোটামুটি বুঝি। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া যদি বা তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারি, বস্তু-নির্দেশ করিয়া তাহার রূপ দেখাইয়া দেওয়া আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু গণ-সাহিত্য কি বস্তু? গণ বলিতে বুঝি অখণ্ড, সমগ্র সমাজ; আর গণ-সাহিত্য বলিতে বুঝি, যে-সাহিত্যের রস অখণ্ড সমগ্র সমাজ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, সাহিত্য কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন স্রষ্টার হাতে গণ-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্য যদি হয় রসাত্মক বাক্য, গণ-সাহিত্য এমন সর্বানুভূতিসম্পন্ন রসাত্মক বাক্য যাহার রস সর্বজনের পক্ষে অনায়াসলভ্য।

গণ হইতেছে সর্বজন—যাহাকে পূর্বে আমরা অখণ্ড সমগ্র সমাজ বলিয়াছি, কাজেই গণ-সাহিত্য গণ-সাপেক্ষ। সমাজের অখণ্ডতা বা সর্বজনের একতাই এই সাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা। কোন কারণে কোন সমাজের অখণ্ডতা যদি নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে সেই সমাজের বা সেই সময়ের লেখকের পক্ষে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব কি না? আমাদের বিশ্বাস তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা যে-সমাজে বাস করিতেছি তাহা কি গণ-সমাজ? তাহা কি অখণ্ড? তাহাকে কি সমগ্র বলা চলে? যদি তাহা অখণ্ড ও সমগ্র না হয় তবে এই সমাজের লেখকের পক্ষে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব?

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের হাতুড়ির আঘাতে আমাদের সমাজ ক্রমশ ফাটিয়া চৌচির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা ভূতপূর্ব অখণ্ড সমাজের অভূতপূর্ব এক এক খণ্ডের উপরে বসিয়া আছি, মধ্যে দুস্তর বাধা। আমি যে খণ্ডে আছি, মাত্র সেই খণ্ডের লোকই আমার কথা বুঝিতে পারে—অন্য খণ্ডের অধিবাসীরা আমাকে দেখিতেছে বটে, আমি তাহার কাছে ইকনমিক জীবমাত্র, অর্থাৎ তাহার আমি খরিদ্দার, বা মক্কেল, বা জমিদার, বা ভাড়াটিয়া মাত্র, কিন্তু ততোধিক আর কিছুই নয়; তাহার সহিত আমার যে-যোগ তাহা দৈনন্দিন অভাবের সূত্রে; তাহার সহিত আমার ভাব-সূত্র বহু কাল হইল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদের রূপটা শহরে যেমন প্রকট, পল্লী-অঞ্চলে তেমন নয়; কিন্তু তাই বলিয়া পল্লী-সমাজও আজ আর অখণ্ড নয়, শহরের বন্যা পল্লীতে গিয়া ঢুকিয়াছে। এককালে পল্লী যখন সজীব ও দেশের ভারকেন্দ্র ছিল তখন পল্লীই ছিল দেশের ভাবজীবনের সূত্রধার। এখন শহর হইতেছে দেশের ভাব-নায়ক। শহরে একটা হাওয়া উঠিলে—কালক্রমে তাহা পল্লীতে গিয়া পৌঁছায়। এমন কি শহরের রঙ্গমঞ্চে কোন নাটক সার্টিফিকেট না পাইলে পল্লীগ্রামে তাহা অভিনীত হয় না। আগে শহর, পরে পল্লী; আগে কলিকাতা,

পরে নোয়াখালি। ফলকথা, দুই-ই আজ সমভাবাপন্ন—কোনখানেই সমাজের অখণ্ডতা আর আজ নাই। এ-হেন খণ্ড-সমাজে বসিয়া অখণ্ড সমাজের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসকে কি বলিব? লেখকদের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস না-ই করিলাম, কিন্তু জীবনের মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে যথোপযুক্ত জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞানবিবর্জিত আন্তরিকতার ন্যায় বিভ্রান্তকারী বস্তু অল্পই আছে।

গণ-সাহিত্যিকগণ বা তাঁহাদের ফিলসফার-গণ বলিতে পারেন যে, গণ নাই বটে কিন্তু ঐ গণ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই গণ-সাহিত্যের সৃষ্টি। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, গণ-সাহিত্য রচনা করিয়া সমাজকে সর্বজনীয়তায় উদ্বোধিত করিবেন এবং উদ্বোধনের ফলে খণ্ড-সমাজ দানা বাঁধিয়া অখণ্ড হইয়া উঠিবে। একথা যদি তাঁহারা বলেন, তবে অন্তত তাঁহারা মানিয়া লইবেন যে বর্তমান সমাজ আর গণ-সমাজ নয়—তাহা সমাজের অগণ্য খণ্ডাংশ মাত্র। এইবারে আর একটা জটিল তর্কের ভূমিকা রচিত হইল। সমাজ-রচনার উপরে, রাষ্ট্র-সৃষ্টির উপরে লেখকদের কতখানি প্রভাব? লেখকদল সমাজেরই সৃষ্টি—এই সত্যকে গণ-সাহিত্য-তাত্ত্বিক কারণে অকারণে সর্বদাই ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজকে লেখকগণ কি পরিমাণে সৃষ্টি করিতে সক্ষম? সমাজ ও রাষ্ট্র মুখ্যত, সংস্কারক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রবীরগণের সৃষ্টি; গৌণত মাত্র সাহিত্যিকগণ তাহাকে প্রভাবিত করিতে পারেন। ভল্‌টেয়ার, টলস্টয় ও বার্নার্ড-শ প্রভৃত পরিমাণে তাঁহাদের সমাজকে গঠিত ও প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—একথা সত্য, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইঁহারা তিন জনেই কেবল মাত্র সাহিত্যিক নহেন। ইঁহারা তিনজনেই সমাজ-সংস্কারক ও ঋষি-দৃষ্টি-সম্পন্ন Prophet। ইঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি না করিলেও নিজেদের মনীষার দ্বারা স্ব-কালকে ও স্ব-সমাজকে প্রভাবিত করিয়া যাইতে পারিতেন; আমার তো বিশ্বাস—ইঁহারা যদি সাহিত্যিক না হইতেন, তবে স্ব-সমাজ ও স্ব-কালের উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইতে পারিতেন।

সাহিত্যিকগণ পরোক্ষভাবে স্ব-দেশকে প্রভাবিত করেন, সেইখানেই তাঁহাদের সাহিত্যিক-প্রতিভা, তাহাতেই তাঁহাদের সাহিত্য-ধর্ম। যদি দেখি যে, কোন সাহিত্যিক প্রত্যক্ষভাবে স্ব-জনকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তবে বুঝিব, সাহিত্যিক-শক্তি ছাড়াও তাঁহার বিশেষ কোন শক্তি আছে, নতুবা বুঝিব এই চেষ্টার দ্বারা তিনি নিজের বিশিষ্ট ক্ষমতার অপহ্নব ঘটাইয়া নিজের ও সাহিত্যের ক্ষতি করিতেছেন। বাঙলা দেশের গণ-সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে তো ভল্‌টেয়ার-টলস্টয়ের সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না। আর, এত সূক্ষ্ম বিচারেই বা প্রয়োজন কি? তাঁহাদের সৃষ্ট তথাকথিত গণ-সাহিত্যের দিকে তাকাইলেই মুহূর্তে সব সন্দেহের নিরসন হইবে। এই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে প্রকৃত গণ-সাহিত্যের সর্বজনীয় প্রেরণার আভাস মাত্র নাই—আছে উপদলীয় শুড়শুড়ি মাত্র; এই ক্ষীণ শিখাগুলি উপদলীয় প্রচার-পত্রের বাতাসে জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া যায়; আকাশের তারার শাশ্বত দীপ্তি ইহাদের নাই—আছে দলীয় বাষ্পের বিষ-নিশ্বাসে কলুষিত সর্বনাশের অভিমুখে আকর্ষণ-করা জলা-জমিতে সঞ্চরণকারী আলেয়ার চোখের ইঙ্গিত; আর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, বহু বাঙালী লেখক সেই দিকেই প্রধাবিত। বাঙলা সাহিত্যের এই দুর্যোগের রাত্রি প্রভাত হইলে গণ-সাহিত্যের রক্তদহ বাঙালী সাহিত্যিকের হেটমুণ্ড মৃতদেহে পরিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কে ইহাদের নিরস্ত করিবে? তাহাদের এক কানে উপদলীয় ভূত-তন্ত্রের তান্ত্রিকতা, আর অপর কর্ণে জ্ঞানবিবর্জিত আন্তরিকতা নিরন্তর ফুসলাইতেছে। আলেয়া-মুগ্ধ পথিকের চোখে তারার দীপ্তি অবাস্তব বলিয়াই মনে হয়।

গণ-সাহিত্যিকগণ একটি স্থূল সত্য বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ প্রভৃতির যেমন বিশিষ্ট দাবী আছে, তেমনি শিল্পেরও একটি দাবী আছে। সেই দাবী উপেক্ষা করিলে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পেই শিল্পের শেষ বা সার্থকতা, এমন কথা বলিতেছি না। শিল্পের জন্যই জীবন নয় জানি—আরও জানি যে, জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যই শিল্প।

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার পক্ষে সহায় হইতে পারে এমন মহৎ শিল্প সৃষ্টি করিতে গেলে তাহার দাবী পূরণ করিয়া তাহার নিয়মানুগ হইয়া চলিতে হইবে। দলীয় ধ্বজা বহন করিবার উদ্দেশ্যে, ছকুমিঞার স্যাকরা-গাড়িতে স্বর্গের অশ্বিনীকুমার-যুগলকে জুড়িয়া দিলে চলিবে না। বাঙলাসাহিত্যে আজ সেই চেষ্টা হাস্যকর ভাবে প্রকট। মহৎ শিল্প জীবনধর্ম-সাধনার উত্তরসাধক। মহৎ শিল্পের মুখে মানুষ মানুষের কথা চায়। দরিদ্রের কথা, নিপীড়িতের কথা, ভিক্ষুকের ছিন্নকন্থায় তাহার কোন আগ্রহ নাই। কিংবা জীবনই ছিন্ন-কন্থা পরিয়া—বার্ধক্যের জীর্ণমূর্তি ধরিয়াই মহতী বাণীর সমক্ষে আবির্ভূত হয়; আর সেই শিল্পলক্ষ্মীর—তপশ্চারিণী উমার—দৃষ্টি তাহার আপাত-দারিদ্র্য ও জরার অভ্যন্তরের নিত্য-যৌবন, অনন্ত-ঐশ্বর্য, শিব-সত্তাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। এইখানেই তো শিল্পলক্ষ্মীর তপস্যার সার্থকতা। জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অবশ্যই আছে—কিন্তু যে-শিল্প কেবল ওইটুকুই দেখিল, তদতিরিক্ত মহত্তর আর কিছু দেখিতে বা দেখাইতে সমর্থ হইল না—তাহার কি এমন সার্থকতা? দৈনন্দিন বাস্তবকে জানা-ই যদি সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য হয়—তবে সংবাদপত্র পড়িলেই চলে। পুস্তকাকারে মুদ্রিত সংবাদহীন সংবাদপত্র পড়িতে যাইব কেন? দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের মতো শিল্প মানুষের দৃষ্টিশক্তির বিবর্ধক। কিন্তু যে-শিল্প সাদা-কাচের চশমা, যাহার মধ্যে সেই বাস্তব বাস্তবই থাকিয়া যায়—তাহাকে নাকের সহিত আঁটিয়া রাখিবার কি যুক্তি? শিল্পের দূরবীক্ষণে যদি গ্রহতারা নিত্য-রসে উদ্ভাসিত না হইল, অণুবীক্ষণের মধ্যে বস্তুকণিকা-পুঞ্জের কুরুক্ষেত্র সন্দর্শন যদি না ঘটিল—তবে এত কষ্ট করিবার সার্থকতা কোথায়?

শিল্প মানব-জীবনোপলব্ধির সহায় বলিয়াই মানুষ শিল্পের মধ্যে সেই মানুষের কথাই শুনিতে চায়। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি প্রকৃত গণ-সাহিত্যের মূলকথা মানুষের কথা। ইহাদের সবগুলির প্রধান চরিত্র—সম্রাট, রাজা, সামন্ত-বীর প্রভৃতি; অর্থাৎ, গণ-সাহিত্যিকদের ভাষায়

aristocrat। রাজা-রাজড়াদের কাহিনী লিখিত হওয়া সত্ত্বেও এই সব মহাকাব্য হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া লোকে—এবং সর্বশ্রেণীর লোকে—কেন আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়া আসিতেছে—ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? তাহার একমাত্র কারণ, ব্যাস, বাল্মীকি ও হোমার মহৎ-শিল্পের দাবীর নিকটে আত্ম-সমর্পণ করিয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষের কথা লিখিয়াছেন, আর সেই টানে জীবনের দুঃখ-দৈন্যও আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে: তাঁহারা জানিতেন, কবিতাকে বনিতার মতো করিয়াই আকর্ষণ করিতে হয়। পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর মিলন সত্য হইয়াছিল—কেননা তাঁহারা মানুষটিকে চাহিয়াছিলেন। দুঃশাসন বৃথা তাহার বসন ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে পায় নাই—বরঞ্চ ক্রোধের ফলে তাহাকে মরিতে হইয়াছিল। গণ-সাহিত্যিকগণ সেই দুঃশাসনের লীলায় নিযুক্ত। শিল্পলক্ষ্মীর বসন আকর্ষণ করিয়া তাহারা তাহাকে পাইতে চায়! হোমার যদি মুখ্যত দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা লিখিতেন তবে তাঁহার কাব্য আজ কেহই স্মৃতিধার্য করিয়া রাখিত না—এমন কি, তাঁহার নিজেরও ভিক্ষামুষ্টি জুটিত কিনা সন্দেহ। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার মহৎ-শিল্পের নিয়মজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টিকে কিছুতে বাধা দিতে পারে নাই, না রাজার ঐশ্বর্য, না দরিদ্রের কন্থা—সর্বত্রই তাঁহারা মানুষকে আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কথিত গণ-সাহিত্যিকদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, একটা আস্ত মানুষ পাইলে যতক্ষণে তাহার মধ্যেকার দুর্গত ইকনমিক মানুষকে তাহারা আবিষ্কার করিতে না পারে ততক্ষণ তাহাদের স্বস্তি নাই। পুরাকালের এক রাজা যাহা স্পর্শ করিতেন, সোনা হইয়া যাইত। গণ-সাহিত্যিকগণ যাহা স্পর্শ করে অমনি তাহা লোহা হইয়া যায়। মানুষের ইকনমিক কঙ্কালটাকে আবিষ্কার করাই তাহাদের শিল্প-ধর্ম। রক্তমাংসের সজীব মানুষ ছাড়া আর কিছুতেই শিল্পের চিরন্তন আগ্রহ নাই। সে ঈশপের গল্পের ভালুকের মতো জীবন্ত মানুষ ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করে না। আমাদের গণ-সাহিত্যিকদের সাহিত্য

কঙ্কালের জাদুঘর। তাহাতে ক্ষণকালের কৌতূহল আছে, চিরকালের সহানুভূতি নাই।

২

পূর্ব অধ্যায়ে গণ-সাহিত্য বলিতে কোন্ শ্রেণীর রচনা বুঝি, প্রসঙ্গত আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এবারে অধিকতর দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদতর ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

হোমারের কাব্য গণ-সাহিত্য; তাঁহার কাব্যদ্বয়কে গণ-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডি-লেখকগণের রচনা কেবল আংশিক গণ-সাহিত্য। গ্রীক ট্র্যাজেডি বিশেষ একটা ধর্ম-বিশ্বাসের একানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হোমারের কাব্যের প্রতিষ্ঠা অধিকতর বিস্তৃত ভূমির উপরে। তাহাদের উপভোগের জন্য কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের ঘটকালির প্রয়োজন হয় না।

আবার ইংরাজী সাহিত্যে চসারের কাব্য ও শেক্সপীয়ারের নাটক গণ-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শেক্সপীয়ারের পরে ইংলণ্ডে গণ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। জার্মান সাহিত্যে অনেক মহারথ সাহিত্যিক আছেন, গ্যয়টে তো আধুনিক ইউরোপের কবিকুল-গুরু। তৎসত্ত্বেও জার্মান ভাষায় যে গণ-সাহিত্য রচিত হয় নাই, তাহার কারণ, বর্তমান জার্মান সাহিত্যের অভ্যুদয় হয় এমন একটা সময়ে—যখন জার্মান-সমাজ খণ্ডিত হইয়া রহিয়াছিল। মার্টিন লুথারের নবধর্মমত-প্রচারের ফলে জার্মান সমাজে, তথা পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বদেশের সমাজ-জীবনে প্রকাণ্ড একটা ফাটল দেখা গিয়াছিল। জার্মান সাহিত্যে গণ-সাহিত্যের সন্ধান করিতে হইলে তৎপূর্বে যাইতে হইবে। জার্মানীর পুরাণে ও রূপকথায় গণসাহিত্যের উপাদান নিশ্চয় আছে। কিন্তু যখন হইতে সে-সাহিত্য ইউরোপীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ গ্যয়টের

পরবর্তী যুগে—তখন আর প্রকৃত গণ-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই।

রুশ-সাহিত্য আরও আধুনিক। টলস্টয় পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার War and Peace আধুনিক জীবনের মহাকাব্য। তৎসত্ত্বেও তাহা গণ-সাহিত্য নয়। বরঞ্চ তাঁহার Twenty Three Tales কিয়ৎ পরিমাণে গণসাহিত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসী-দেশের সমাজ গণসাহিত্য-রচনার পক্ষে অধিকতর অনুকূল ছিল। কারণ সেখানে ধর্মবিশ্বাসে ফাটল ধরে নাই—আর রাষ্ট্রীয় একানুভূতি ফরাসী-বিপ্লবের আগে অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তথাপি সে দেশে গণ-সাহিত্য বিরল। ফরাসী গণ-সাহিত্যের নমুনা সংগ্রহ করিতে হইলে Chanson de Roland-জাতীয় রচনার নাম করিতে হয়। ফরাসী দেশে কর্ণেঈ, রাসিন প্রভৃতি মহারথ নাট্যকার আছেন। কিন্তু ইঁহারা ভার্সেঈ-সমাজের জন্য নাটক লিখিয়াছিলেন—সমগ্র সমাজের রস-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নহে। মলিয়েরের নাটকে গণ-সাহিত্যের উপাদান অধিকতর মাত্রায় আছে বটে।

ভারতীয় ভাষাসমূহে গণ-সাহিত্যের দৃষ্টান্ত অবিরল নহে। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত গণ-সাহিত্য। হিন্দী তুলসীদাসী 'রামচরিত-মানস' গণ-সাহিত্য। বাঙলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত গণ-সাহিত্য। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের গীতি-কবিতা গণ-সাহিত্য। বাঙলার পাঁচালী ও যাত্রা (নিতান্ত আধুনিক কালে লিখিত বাদে) গণ-সাহিত্য। ময়মনসিংহ-গীতিকার অনেকগুলি পালা (আধুনিক গবেষকগণের স্থূলহস্তাবলেপের চিহ্ন ছাড়িয়া দিলে) গণ-সাহিত্য। কালিদাস ভারতীয় লৌকিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁহার কাব্য ও নাটক গণ-সাহিত্য নয়। দৃষ্টান্ত আরও বাড়ানো যাইতে পারে—কিন্তু ইহাই যথেষ্ট মনে করি।

যে-সব রচনার নামোল্লেখ করিলাম তাহাদের মধ্যে দেশ, কাল ও রসোত্তীর্ণ-তার প্রভেদ বিস্তর। হোমারের কাব্য ও বাঙলা পাঁচালীর একত্র উল্লেখ এই

বোধ হয় প্রথম—কিন্তু তাহাতে বিস্মিত বা ভীত হইবার কারণ নাই। আবার কালিদাসের কাব্যকে যে-পদবী দান করিতে পারি নাই, সেই পদবী যাত্রাওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদের ভাগ্যে জুটিল—ইহাকেও অনেকে অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারেন।

কিন্তু কেবল স্মরণ রাখিলেই চলিবে যে, গণ-সাহিত্য আর উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সর্বত্র এক বস্তু নয়। কোন রচনা গণ-সাহিত্য হইয়াও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য না হইতেও পারে—আবার কোন রচনার পক্ষে একাধারে গণ-সাহিত্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হওয়া অসম্ভব নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও গণ-সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রসোত্তীর্ণতার বিচারে ওডিসি বা রামায়ণে চরম উৎকর্ষ—কিন্তু বাঙলা যাত্রা-পাঁচালা কিছুই নয়। রসোত্তীর্ণতার বিচারে শকুন্তলা চরম উৎকর্ষ—কিন্তু তবু তাহা গণ-সাহিত্য নয়। যে সব রচনার উল্লেখ আমরা করিয়াছি—পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের মাথায় ছোট-বড় সহজেই চোখে পড়িবে—কিন্তু গোড়ায় তাহাদের মধ্যে একটা ঐক্য আছে, তাহাদের পায়ের নিচের ভিত্তিটা একই সমতলে অবস্থিত। আর একই সমতলে দণ্ডায়মান বলিয়াই হোমারের ও অখ্যাত বাঙালী পাঁচালীকারের মাথার উচ্চনীচতা অতি অনায়াসে স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

গণ-সাহিত্য বলিয়া উল্লেখিত রচনাসমূহের আপাত-বৈসাদৃশ্যের অন্তর্গত সামান্য ধর্ম বা লক্ষণটি কি? গণ-সাহিত্য সমাজের সেই অবস্থার রচনা যখন সমগ্র সমাজ অখণ্ড ছিল। যখন লেখক ও বৃহত্তর পাঠকসমাজ একই বিশ্বাস একই সংস্কার (অনেক সময়ে কুসংস্কারও বটে), একই স্বর্গ-নরক ও পরিণামে আস্থাবান ছিল। অর্থাৎ হোমার ও একজন নগণ্য গ্রীক একই সমতলে অবস্থিত ছিল; তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষী ও অখ্যাত পাঁচালী-কার একই বিশ্বাসের আবহাওয়ায় বিচরণ করিত। হোমার ও তৎকালীন সাধারণ একজন গ্রীকের মধ্যে যে-প্রভেদ তাহা কেবল ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রভেদ। তাহাছাড়া অন্য প্রভেদ ছিল না। শেক্সপীয়ারের সহিত Tudor-ইংলণ্ডের

সাধারণ অধিবাসীর মৌলিক কোন প্রভেদ নিশ্চয় ছিল না। শেক্সপীয়ারের নাটকে অনেক অতিপ্রাকৃত ব্যাপার আছে। সেই সব অতিপ্রাকৃতে শেক্সপীয়ার নিজে বিশ্বাস করিতেন কি না এমন একটা বিতর্ক শুনিতে পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ার বিশ্বাস করিতেন কিনা জানিনা—তবে একথা বলিতে পারা যায় যে, তিনি ও তাঁহার সমাজের নগণ্যতম ব্যক্তি অতিপ্রাকৃতে একই প্রকার বিশ্বাস পোষণ করিতেন। ফলকথা তাঁহার ও তৎকালীন অখ্যাত, অজ্ঞাত একজন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা গুণগত নয়, নিতান্তই মাত্রাগত। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কালের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা আর মাত্রাগত নয়, একেবারে গুণগত। তিনি ও উক্ত ব্যক্তি এক সমতলে অবস্থিত নহেন। পায়ের তলাকার মাটিতে উচ্চাবচতা ঘটিয়া গিয়াছে। গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির যে সমাজ, তাহার জমি একটানা সমতল, আর আধুনিক সমাজের জমি অনেকটা ক্রমোচ্চ সোপান-পরম্পরার মতো। এখন লেখক যে-সোপানে, পাঠক সে সোপানে নয়—সব পাঠক এক সোপানে নয়; এই ভাবে দণ্ডায়মান বলিয়াই অনেক সময়ে সকলকে মাথায় সমান দেখায়—তাহাকেই আমরা গণতন্ত্রের সুফল বলিয়া মনে করি, কিন্তু পায়ের তলাকার মাটির দিকে তাকাই না। তাকাইলে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিতাম।

সমতল সমাজ যে সোপানীকৃত সমাজ হইয়াছে, অখণ্ড বিশ্বাসের বন্ধন যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, একই সমাজ যে বহু সমাজের গুচ্ছে পরিণত হইয়াছে—ইহার মূলে দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক হাতুড়ির আঘাত আছে। সে-সব বিচারের সময় এখন নয়। কিন্তু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আবার ইতিহাসের হাতুড়ি যতক্ষণ না সোপানীকৃত সমাজকে এক সমতলে পরিণত করিতেছে—ততক্ষণ গণ-সাহিত্য-রচনার পটভূমি প্রস্তুত হইবে না। গণ-সাহিত্যের পটভূমি বা আবহাওয়া রচিত হইলে লেখকগণ অনায়াসে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন, তজ্জন্য কোন ভেরী-বাদন বা আন্দোলনের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু সেই পটভূমি রচনা কোন সাহিত্যিকের সাধ্যায়ত্ত নয়।

যে-সব ক্রান্তিপাতের ফলে ইতিহাস সৃষ্টি হয়—তাহার উপরে সাহিত্যিকদের প্রভাব অতিশয় নগণ্য। যতদিন না সমাজে সেই অবস্থার উদ্ভব হইতেছে ততদিন লেখকগণ 'বুর্জোয়া'-সাহিত্য রচনা করিলে শক্তির সদ্ব্যবহার করা হইবে—নিদেন পক্ষে চোরা-কারবারের বাজারে নামিয়া পড়িলেও অধিকতর সুফল পাইবার আশা।

৩

গণ-সাহিত্যের একটি প্রধান অন্তরায় গণতন্ত্র। কথাটা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক্। গণ-সাহিত্য বলিয়া যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের প্রায় সমস্তই কবিতায় লিখিত। গণ-সাহিত্যের বাহন ছন্দ। এই অত্যাবশ্যক তথ্যটি সর্বদা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সাহিত্য গণ-সাহিত্য হইয়া উঠিতে গেলে প্রথমে তাহাকে ছন্দ-বাহন আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সে আশা গণতন্ত্রের যুগে আছে বলিয়া মনে হয় না। গণতন্ত্রের ভাষা গদ্য, গদ্য চিন্তার বাহন। পদ্য অনুভূতির বাহন। চিন্তায় মানুষে মানুষে স্বাতন্ত্র্য; অনুভূতিতে মানুষে মানুষে ঐক্য। গণ-তান্ত্রিক সমাজে মানুষ হইতে মানুষ ক্রমেই অধিকতর পৃথক হইয়া পড়িতেছে। সেই ক্রমবর্ধমান দূরত্বকে জোড়াতালি দিয়া ঢাকিবার চেষ্টায় গণ-তান্ত্রিক নেতাগণ প্রাণান্ত করিয়া মরিতেছেন। গণ-সাহিত্যের বাহন পদ্য হওয়াতে মানুষকে একানুভূতির অলক্ষ্য বন্ধনে যে কেবল দৃঢ়-সংসক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাই নয়, সে সংসক্তি তো সমাজের অখণ্ডতাতেই সম্পন্ন হইয়াছে; ছন্দ সমাজের সেই মৌলিক অখণ্ডতাকে রক্ষা করিতেছে—সমাজ যাহাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে। হোমার গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেন, ইহা বাস্তব তথ্য কি না জানি না। তবে ইহার ভাগবত সত্যে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। হোমারের ভিক্ষা-মুষ্টি কেবল দরিদ্রের গৃহ হইতে

আসিত না, তাহাতে ধনীর ভাণ্ডারের দানও ছিল। অর্থাৎ ধনীতম হইতে দরিদ্রতম—সমাজের স্বরসপ্তক—সকলই তাঁহার গানে জাগিয়া উঠিত। এইখানেই তাঁহার গানের সর্ব্বজনীনতা। এখন আমরা কি করি? ভিক্ষুক আসিয়া জান্‌লার বাহিরে গান ধরিলে তাহাকে গান থামাইতে বলিয়া তবে ভিক্ষামুষ্টি দান করি। তাহার গানকে আমরা স্বীকার করি না। অর্থাৎ একটা ভিক্ষুক আমাদের কাছে আজ নিতান্তই একটা 'ইকনমিক জীব' মাত্র—ততোধিক কিছু নয়। কিন্তু হোমার তাঁহার সমাজে ভিক্ষুক ছিলেন না—তিনি দৈববাণী বিতরণ করিয়া ফিরিতেন। তখনকার সমাজ অখণ্ড ছিল—ছন্দ অখণ্ড সমাজের বাণীরূপ ছিল, সমাজের অখণ্ডতা বজায় রাখায় তাহার হাত ছিল। ছন্দ যুগপৎ অখণ্ড সমাজের সৃষ্টি, আবার অখণ্ড সমাজের রক্ষক। আধুনিক সমাজ বহুখণ্ডিত, ছন্দ এখানে একেবারেই পঙ্গু।

আধুনিক খণ্ডিত সমাজের সাহিত্যিক রাজপথ উপন্যাস। অখণ্ড সমাজের রাজপথ ছিল মহাকাব্য বা নাটক। উপন্যাস একক-পাঠকের পাঠ্য, মহাকাব্য বা নাটক যৌথ-পাঠকের শ্রাব্য। আধুনিক পাঠক নিঃসঙ্গ—সে একাকী বসিয়া কৃপণের ধনের মতো উপন্যাসের রসাস্বাদন করে। গণ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠক বলিয়া কিছু ছিল না—তাহারা সকলেই শ্রোতা। যৌথভাবে, সমাজ-বদ্ধভাবে তাহারা কাব্যরস উপভোগ করিত। লোকে যেমন দল বাঁধিয়া মেলা দেখিতে যায়, দেবদর্শনে যায়—তেমনি যাত্রা শুনিতে, পাঁচালি শুনিতে বা কথকতা শুনিতে যাইত। তখন লেখকের সহিত শ্রোতার, শ্রোতার সহিত শ্রোতার কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছিল। এই অনিবার্য 'সহিত'-এর সমন্বয়ে সাহিত্য তখন সত্যই সাহিত্য ছিল। এখন সাহিত্য আর সাহিত্য নয়। সেই 'সহিত' ঘুচিয়া গিয়া সাহিত্য এখন তাহার মৌলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। যতদিন সাহিত্যের মধ্যে 'সহিত'-এর ভাব ফিরাইয়া আনা সম্ভব না হইতেছে—ততদিন গণ-সাহিত্য কেমন করিয়া সম্ভব?

তবে কি ছন্দ অবলম্বন করিয়া রচনা লিখিতেই গণ-সাহিত্য হইয়া উঠিবে?

তাহাও হইবার নয়। যে-হেতু ছন্দ সমাজের একটা বিশেষ অবস্থার লক্ষণ, সেই বিশেষ অবস্থা যতক্ষণ না ফিরিতেছে ছন্দ ফিরিবে কেমন করিয়া? তেমন বৃথা চেষ্টা করার চেয়ে বরঞ্চ গদ্যে লিখিয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তাহাতে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি হইবে না বটে—তবে গণ্য-সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

বর্তমান যুগ সাহিত্যকে কান হইতে চোখে ঠেলিয়া দিয়াছে, সাহিত্য আর শ্রাব্য নয়। গণ-সাহিত্যের একটা লক্ষণ যেমন ছন্দ, তেমনি আর একটা লক্ষণ—তাহা শ্রাব্য। বোধ করি, ছন্দযুক্ত বলিয়াই শ্রাব্য। বোধ করি, ছন্দযুক্ত বলিয়াই শ্রাব্য হওয়া সহজ হইয়াছে, বোধ করি অখণ্ড সমাজে শ্রাব্য হওয়াই স্বভাব-সঙ্গত, কিন্তু বর্তমান সাহিত্য পাঠ্য। চোখের সাহিত্য স্বল্পলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। কানের সাহিত্যের সে বাধা নাই। অর্থাৎ চোখে-পড়া সাহিত্যের আসরে অধিকাংশ লোকের স্থান নাই—কানে-শোনা সাহিত্যের অবাধ আসর। সাহিত্য অক্ষর-গত হইয়া পড়াতে তাহার সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। গণ-সাহিত্যের সৃষ্টির পক্ষে ইহাও একটা অন্তরায় বটে। কোনকালে সাহিত্য যদি আবার শ্রাব্যত্ব লাভ করে, তবেই গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির পথ সুগম হইবে। বেতার-যন্ত্রের বহু-প্রচলনের ফলে সাহিত্য কিয়ৎ পরিমাণে শ্রাব্য হইয়াছে। বেতারের প্রচার সর্বজনীন হইলে, তাহার অপব্যবহার বন্ধ হইলে, শুভ বুদ্ধির সহযোগে তাহার সদ্ব্যবহার হইলে—তবে হয় তো সাহিত্যের শ্রাব্যধর্ম আবার ফিরিয়া আসিলেও আসিতে পারে। শ্রাব্যত্ব ও ছন্দ—গণ-সাহিত্যের দুই প্রধান লক্ষণ। কিন্তু লক্ষণ ফিরিয়া আসিলেই যে বস্তুটি ফিরিয়া আসিবে এমন মনে করিবার হেতু নাই। গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চাই সমাজের অখণ্ডতা। সেই অখণ্ডতা যতদিন না সাধিত হইতেছে—ততদিন গণ-সাহিত্য-সৃষ্টির কিছুমাত্র আশা নাই।

জাতিস্মর সাহিত্য

কিছুদিন হইতে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে, বাঙলা সাহিত্য ক্রমেই জাতিস্মর হইয়া উঠিতেছে। একটা জাতের মধ্যে দুই চার জন লোক জাতিস্মর হইলে কৌতুকের হইতে পারে—কিন্তু সমগ্র জাতটাই যদি জাতিস্মর হইয়া উঠিবার প্রবণতা দেখায়, তবে বিষম আশঙ্কার কথা। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। এপার হইতে ওপারে যাইবার সময়ে বৈতরণীর জলে অবগাহন করিয়া যাইতে হয়—ওই জল পূর্বকথার বিস্মরণী, এপারের কথা ওপারে যাহাতে মনে না থাকে, সেই কারণে এই ব্যবস্থা। জন্মের আগেও আর একবার বৈতরণীতে ডুব দিয়া তবে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। জন্ম শুধু রূপান্তর নয়, তাহা মনান্তরও বটে। দেহ এবং মন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া পুনরায় আবির্ভূত হয়। সাহিত্য-জগতেও এই রকম একটা বৈতরণী আছে। বাহিরে বাস্তব জগৎ আর শিল্পীর অন্তরে কল্পনার জগৎ—এ দুটি যেন শিল্প-লোকের ইহলোক আর পরলোক। মাঝখানে রহিয়াছে লেখকের মন—এই মনটিই সাহিত্যের বৈতরণী।

বাস্তবের ছাপ নিরন্তর লেখকের অন্তরে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, আবার লেখকের কল্পনা নিরন্তর শিল্পাকারে বহির্মুক্তি লাভ করিতেছে। আর উভয়েই যাতায়াতের পথে একবার করিয়া লেখকের মন-বৈতরণীতে ডুব দিয়া যাইতেছে। স্নান সারিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের রূপান্তর ঘটিতেছে, পূর্ব রূপ ও পূর্ব সংস্কার সাপের খোলসের মত স্খলিত হইয়া পড়িয়া এমন অভিনবত্ব প্রকাশ করিতেছে যে তাহাদের আর চিনিবার উপায় থাকে না। শিল্পের পক্ষে এই রূপান্তর অত্যাবশ্যক, কিংবা এই রূপান্তরতাকেই শিল্প বলা যাইতে পারে। তবে সবক্ষেত্রে সমান রূপান্তর অবশ্য ঘটে না। কোথায়

কতটুকু রূপান্তর ঘটিবে, তাহা লেখকের শক্তির উপরে অর্থাৎ তাহার মন-বৈতরণীর গভীরতা ও বিশুদ্ধতার উপরে নির্ভর করে। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, রূপান্তরের একটা প্রক্রিয়া সর্বদাই চলিতেছে। কোথাও যদি রূপান্তর না ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে লেখকের মনে বৈতরণী নাই অর্থাৎ সে লেখক নহে, কিংবা তাহার বৈতরণী শুকাইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ তাহার সাহিত্যিক ক্ষমতা লুপ্ত, কিংবা বাস্তবের চাপ আদৌ বৈতরণী অতিক্রম করে নাই—অর্থাৎ লেখক সাহিত্যিক নয়, জর্নালিস্ট মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ দিয়া শুরু করিয়াছিলাম—এবার সেখানে ফিরিয়া আসা যাক্। গত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বাঙলা বই প্রকাশিত হইয়াছে। হঠাৎ এমন অভাবিত আধিক্যের কারণ কি জানি না, বোধ করি কাগজের অভাবেই এমন ঘটিয়াছে। এই সব পুস্তকের অধিকাংশই উপন্যাস ও গল্প। কিছু প্রবন্ধ ও কবিতাও আছে। প্রায় সবগুলিরই উপজীব্য কোন না কোন আকারে দেশের সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা। পঞ্চাশের মন্বন্তর, তৎপরবর্তী মহামারী, কিংবা আগস্ট-বিপ্লব বা যুদ্ধকালীন নিদারুণ অভিজ্ঞতা। মোটামুটি এই কয়েকটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া গত কয়েক বছর ধরিয়া বাঙালী লেখকগণ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এমন হইয়া থাকে এবং এমন হওয়াই উচিত। বাঙালী লেখক যে বাস্তব-তৎপর, পরিবেশগ্রাহী, স্বজন-বৎসল —ইহা তাহারই প্রমাণ। কাজেই ইহা শুভসূচী। বাঙালী হিসাবে তাঁহারা নিজেদের কর্তব্যে সমুৎসুক—ইহাতে আনন্দিত না হইবে এমন বাঙালী কে আছে? কিন্তু বাঙালী লেখকদের কাছে জাতি যে দাবী করে, তাহা কেবল ব্যক্তি হিসাবে নয়, লেখক হিসাবে। ব্যক্তি-কর্তব্যের চেয়ে লেখকের কাছে শিল্পী-কর্তব্য উচ্চতর স্তরের হওয়া উচিত। নতুবা তিনি জাতিকে তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ তাঁহার মনকে নাড়া দিয়াছে, ইহা যেমন আনন্দের কথা, তেমনি এই আন্দোলনে ভূগর্ভের রত্নখনি উদ্ঘাটিত হইল কি না, তাহাও তেমনি বিচারের কথা। কিংবা

পূর্বতন উপমাকে অনুধাবন করিয়া বলিতে পারি, দুর্ভিক্ষের ছাপ লেখকের মন হইতে শিল্পলোকে বহির্মুক্তি লাভের সময়ে বৈতরণী-স্নান সমাপন করিয়া শিল্পসম্মত রূপান্তর লাভ করিল কি না—তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয়। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে এ প্রবন্ধ লিখিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু যদি তাহা না হয় বা কেবল আংশিক মাত্র হয়, তবে বুঝিতে হইবে বাঙলা সাহিত্যের নামে বাঙলা ভাষায় কেবল জর্নালিজম্ চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষটা লেখক ও প্রকাশকের পক্ষে সুভিক্ষ হইলেও বাঙলা সাহিত্য সত্যসত্যই উপবাসী ছিল। বাঙলা দেশের মতো বাঙলা সাহিত্যেও দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া গিয়াছে—এখন পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ মহামারী চলিতেছে। বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে ইহা সত্যসত্যই মন্বন্তর। কারণ অধিকাংশ লেখক ও পাঠক 'জর্নালিজম্'কে সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া যদি গ্রহণ করে, তবে ভবিষ্যতের শিল্পাদর্শের পক্ষে তাহাকে নিতান্ত অকল্যাণকর বলিতে হইবে। এই কয়েক বছরের সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে, অনেক উচ্চশ্রেণীর শিল্পী তত্ত্বের খাতিরে, দেশপ্রেমের খাতিরে, সুলভ খ্যাতি ও দুর্লভ অর্থের খাতিরে নিম্নশ্রেণীর সাংবাদিকে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ বই যেন খবরের কাগজের 'কাটিং' কাটিয়া রচিত। তাহা সাহিত্যের বকলমের নীরস ডায়ারি। সাহিত্য ও সংবাদপত্র এতদিন আড়াআড়ি করিয়া আসিতেছিল; আজ হঠাৎ চৌর-মৈত্রীতে চিরকালের ভেদ ঘুচাইয়া এক কিম্ভূত মূর্তি লাভ করিয়াছে। সাহিত্য ও সংবাদপত্র দুই-ই স্বক্ষেত্রে প্রধান এবং অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুইয়ে মিলিয়া হঠাৎ জগন্নাথ-ক্ষেত্র রচনা করিলে কাহারও মঙ্গল হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, কালের দাবীতে সাহিত্য ক্রমেই অধিকতর বাস্তব হইয়া উঠিতেছে—ইহা কি তুমি চাও না? অবশ্যই চাই। বাস্তব ভিত্তি ছাড়া আদর্শ দাঁড়াইবে কোথায়? আদর্শের শুভ্র মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পাথরের পাদপীঠের প্রয়োজন, বাস্তব সেই পাদপীঠ। কিন্তু পাদপীঠখানা প্রস্তুত করিবারও একটা নিয়ম আছে। তা ছাড়া, পাদপীঠটাই সব নয়, তার উপরে

আদর্শের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল কি না, সেদিকেও তো লক্ষ্য দেওয়া দরকার। এমন ক্ষেত্রে বাস্তবকে চাই না—একথা কেহ বলিবে না। কিন্তু আরও একটি কথা আছে। বাস্তব ও আদর্শে যে ভেদ সচরাচর কল্পিত হয় সে ভেদ কি সত্য? কিংবা সে ভেদ কি এতই দুর্ভেদ্য? বাস্তবই কি রূপান্তরে আদর্শ নয়? কিংবা আদর্শই কি রূপান্তরে বাস্তব নয়? শিবের জটায় যে গঙ্গা অবস্থিত, তাহাই আদর্শ; আর মর্ত্যের যে গঙ্গা জনপদের তৃষ্ণা মিটাইয়া প্রবাহিত তাহাই বাস্তব; এ দুয়ের মাঝখানে আছে ভগীরথ-শিল্পীর সাধনা—যাহার বলে গঙ্গা মহাদেবের জটাবাস পরিত্যাগ করিয়া সর্বলোকের আয়ত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তব ও আদর্শ যদি একই বস্তুর রূপান্তর মাত্র হয় তবে এ বিষয়ে তর্কটাও প্রায় অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। আসল প্রশ্নটা দাঁড়ায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সার্থকতা লইয়া। নিছক বস্তু যে বাস্তব নয়, আবার সাহিত্যের বাস্তব যে জাগতিক বাস্তব হইতে ভিন্ন, এ বিষয়ে আশা করি কেহ প্রশ্ন তুলিবেন না। কিন্তু তর্ক বাধিবে আর এক প্রসঙ্গে—যে রচনাকে আমি বাস্তব বলিব, তাহাকে তুমি আদর্শিক বলিবে—আবার উন্টাটাও অসম্ভব নয়। ইহা রুচির কথা—যুক্তির কথা নয়। রুচি লইয়া তর্ক চলে না, কাজেই ক্ষান্ত দিতে হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিবে—দুর্ভিক্ষবিষয়ক রচনায় এত আপত্তি কেন? দেশের প্রতি লেখকের কি কর্তব্য নাই? কর্তব্য আছে বলিয়াই আপত্তি, কর্তব্য না থাকিলে এ প্রসঙ্গের অবতারণাই করিতাম না। কিন্তু সে কর্তব্য লেখকের কর্তব্য। ব্যক্তি হিসাবে কেহ দুর্ভিক্ষে দান করিতে পারে কিংবা অন্য প্রকারে সাহায্য করিতে পারে—সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা সাহিত্য বিচারের এলাকাধীন নয়। লেখক হিসাবে যখন সে কর্তব্য সাধন করিতে যাইবে, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের বাস্তবকে সাহিত্যের বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা সরাসরি তাহার বর্ণনামাত্র করিলে দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে ও সাহিত্যে প্রভেদ কোথায় থাকিল? দুর্ভিক্ষ লইয়া

আগেও তো বাঙলা সাহিত্য রচিত হইয়াছে। 'ছিয়াত্তরের' দুর্ভিক্ষের রূপান্তর বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। তাহা নিছক রিপোর্টের চেয়ে উচ্চতরগ্রামের সত্য বলিয়াই আজও অপাঠ্য হইয়া যায় নাই—কিংবা তাহার মধ্যে চিরন্তন এমন কিছু আছে, যাহাতে তাহাকে 'পঞ্চাশের' দুর্ভিক্ষের শ্রেষ্ঠতম রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব নয়। ইহার কারণ বাস্তবকে তিনি বৈতরণী-স্নানে রূপান্তরিত করিয়া শিল্পলোকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বিপদ হইয়াছে এই যে, আমরা ব্যক্তি-কর্তব্যে ও সাহিত্যিক কর্তব্যে তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছি। ইহার একটা কারণ কুশিক্ষাজাত শিথিল চিন্তা। দ্বিতীয় কারণ বিরাট বিপদের সম্মুখে আত্মবিহ্বল ভাব। ঘরে আগুন লাগিলে জল ঢালিতে হয়, কিন্তু মাথা খারাপ করিয়া শূন্য কুম্ভ উপুড় করিলে তো আগুন নিভিবে না! অব্যবস্থিত সহানুভূতিতে কোন ফলোদয় হইবে না। সহানুভূতির সকল কার্য-কারিতার জন্য ধীরতার প্রয়োজন। বিপদের সম্মুখে ধীরতা সম্ভব নয়। কাজেই বিপদের মধ্যে লিখিত রচনায় বিপদের অভিজ্ঞতা শিল্প-মূর্তি যে লাভ করে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের আর কি আছে?

এইখানে প্রশ্ন উঠিবে যে, মানব-করুণা আমাদের মনে এমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা অপেক্ষা করিতে নারাজ। বিগলিত মানব-করুণা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু বিগলিত করুণাকে ঢালাই করিবার মতো ছাঁচখানা হাতের কাছে আছে কি না, একবার চিন্তা করিয়া দেখাও তো আবশ্যক। উদ্বেলিত মানব-করুণা যত্রতত্র পথেঘাটে নষ্ট হইলে কাহার কি লাভ? মানব-করুণার তাগিদে দানসত্র খুলিয়া দিলে কাহারও আপত্তি করিবার হেতু থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাকে শিল্প-মূর্তি দিতে হইলে অবশ্যই শিল্পসম্মত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

এই মানব-করুণা কথাটা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন 'আণবিক বোমা' বা 'উড়ন্ত রকেটের' মতো একটা নিতান্তই আধুনিক আবিষ্কার। এমন কথাও অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে,

প্রাচীন কালের ক্লাসিকাল লেখকগণ মানব-করুণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, ও বিষয়ে যেন আধুনিকদেরই জিত। সেইজন্য রামায়ণ-মহাভারতে, হোমারের কাব্যে, দান্তের কাব্যে বা শেক্সপীয়রের নাটকাবলীতে দুর্গত ও সর্বহারাদের সমবেদনার রঙে অঙ্কিত বাস্তব চিত্র নাই। তাঁহাদের নায়ক-নায়িকা সকলেই রাজা-মহারাজা, বড় বড় বীর, অতি-মানুষিক যাঁহাদের গুণাবলী। তাঁহারা সর্বহারাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন না। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো সর্বহারার জগৎ আবিষ্কৃতি যেন আধুনিকদেরই বিশেষ একটা কৃতিত্ব। ইহার প্রধান কারণ আর যে শক্তিই তাঁহাদের থাকুক, মানব-করুণায় তাঁহাদের মন এমন উদ্বেজিত ছিল না।

কিন্তু কথাটা কি সত্য? বাল্মীকির উপাখ্যানের মূল সত্যটা কি? যে ঋষির বুক একটি ক্রৌঞ্চকে নিহত হইতে দেখিয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তিনি মানব-করুণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না—ইহা কে বিশ্বাস করিবে? শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত করুণা নয়, আদি-কাব্যের মূলে এই শোকের কাহিনী থাকিয়া শোক ও শ্লোককে ইঙ্গিতময় অর্থে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যিনি এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, তিনি মানব-করুণার চেয়েও ব্যাপকতর ও গভীরতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন—তিনি জীব-করুণার উপরে শিল্পকলাকে চিরকালের জন্য সন্নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি রাজা-মহারাজা কিংবা দুর্গত দরিদ্র কাহারও বধের উল্লেখ না করিয়া সামান্যতম একটি বন্য-পাখীর উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ ক্ষুদ্রতম ও নগণ্যতম। ওই পাখীটির মধ্যে নিছক প্রাণের মূর্তি বিশুদ্ধতম, অর্থাৎ পাখীটা একটা প্রাণীমাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন দুর্গত যতই দুর্গতিগ্রস্ত হোক তাহার মধ্যে প্রাণের এমন নির্বিকার রূপ কখনই দেখা যাইত না। সে প্রাণী, সে মানুষ, সে সংসারী জীব, নানা ছোট-বড় সূত্রে প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটা যেন আচ্ছন্ন। তাহাকে মারিলে কেবল যে একটা প্রাণীমাত্র বধ করা হয়, তাহা নহে; সে আঘাত আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর দাগ রাখিয়া যায়। কিন্তু

মানব-সম্পর্ক-নির্মুক্ত এই বন্য পাখীটা সম্বন্ধে সে কথা খাটে না—সে একটি প্রাণকণিকা মাত্র—তাহার বেশি নয়। এই প্রাণকণিকার মৃত্যু দেখিয়া কবি-চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল—আদি-কবিতার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার মূল সত্য এই যে, কবি ও কবিতার আদিম প্রত্যূষে আছে জীবন-করুণা—যাহা আধুনিকদের কথিত মানব-করুণার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও সত্য।

কিন্তু আর একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না। প্রাচীন কবিগণ কেবল রাজা-মহারাজা বীরপুরুষদের লইয়াই প্রধানত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন কেন? দুর্গতদের কথা তাঁহারা বলেন না কেন? জীব-করুণার তর্ক ছাড়িয়া দিলেও মানব-করুণার অভাব কি ইহাতে সূচিত হয় না? আপাতদৃষ্টিতে তেমন মনে হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। রামায়ণের ঋষি মানুষের দুঃখের কথা বলিতে বসিয়াছিলেন, দরিদ্রের দুঃখের কথা নয়। তবে কি দরিদ্র মানুষ নয়? মানুষ বই কি—কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কিছু। সেটা কি? সে দরিদ্র। অর্থাৎ তাহার দারিদ্র্য, তাহার অভাব, তাহার দৈনন্দিন উদ্বেগ, তাহার মধ্যেকার বিশুদ্ধ মানবরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষকে খুঁজিতে গেলে হাতে বারংবার তাহার দারিদ্র্যটা ধরা পড়ে। তাহার দুঃখের কথার প্রায় ষোল আনাই কোন না কোন রূপে দারিদ্র্যের কথা। দারিদ্র্য মনুষ্যত্বের সঙ্গে অভিন্ন নয়। আমি যাহাকে দারিদ্র্য বলি—তুমি তাহাকেই প্রাচুর্য বলিবে। আবার আজ যে দরিদ্র কাল তার পক্ষে ধনবান হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই দারিদ্র্যের কথায় মানুষের দীর্ঘকাল আগ্রহ থাকা অসম্ভব। বিশেষ, মানুষ তো দরিদ্রের কথা শুনিতে চায় না, তাহার মনের আদিম ঔৎসুক্য মানুষের কথায়—মানুষের সুখদুঃখের বিরহ-মিলনের দোলাবর্তের লীলায়। 'প্রাচীন'দের উদ্দেশ্য ছিল এই মানুষের কথা বলা, আধুনিকদের যেমন দরিদ্রের কথা।

এখন মানুষের চিরন্তন ও বিশুদ্ধ স্তরে পৌঁছিতে গেলে কয়েকটি স্তর ভেদ করিয়া যাইতে হয়, যে স্তরগুলি শাশ্বত নয়, ক্ষণিক। মানুষের জৈব-জীবন

আছে, তাহার সাংসারিক জীবন আছে। জৈব-জীবনে সে প্রায় পশুর সামিল; সাংসারিক জীবনে সে মানুষ বটে, কিন্তু ক্ষণিককালের মানুষ। আজকার প্রয়োজন কাল তাহার থাকে না, আজকার অবস্থা দু'দিন বাদে পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে তাহার চিরন্তন মূর্তি পাইবার আশা নাই। এমন কি তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যেও সে চিরন্তন নয়। এ বিষয়ে একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ আছে, আবার আজকার একের সঙ্গে কালকার একের প্রভেদও কম নয়। কিন্তু কোথায় তাহা হইলে সেই চিরন্তন মানুষ, যাহার সঙ্গে অপরের প্রভেদ নাই, নিজের মধ্যেও যাহার বিরোধ নাই, যে দেশ-বিশেষ ও কাল-বিশেষের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া চিরকালের মানুষের সঙ্গে সমাত্মীয়! এই মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে তাহার জৈব-জীবন, তাহার সাংসারিক জীবন, এমন কি তাহার শিক্ষা-দীক্ষার জীবনের সিংহদ্বার কয়টা পার হইয়া যাইতে হইবে। এ তিনটাকে যথাক্রমে বলা যাইতে পারে পশু-মানব, আর্থিক-মানব এবং সাংস্কৃতিক-মানব। ইউরোপের, কাজেই এদেশের, নবীন সাহিত্যের বিশেষ ঝোঁক এই তিনটার উপরে—যে তিন অবস্থা মানুষের পরিবর্তনশীল ও ক্ষণিক। বর্তমানকাল পরিবর্তনশীল ও ক্ষণিক-ধর্মী, চিরন্তনে তাহার বিশ্বাস নাই, অতএব স্বভাবতই এইসব বিষয়কে সে সাহিত্যিক উপজীব্য করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য তাহার আজকার যুগান্তরকারী বই কালকার আস্তাকুঁড়েও খুঁজিলে মেলে না।

আর 'প্রাচীন'গণ বাহ্য আবরণত্রয়ের অন্তর্নিহিত চিরকালীন মানুষের দুঃখের কথা বলিয়াছেন বলিয়া রামায়ণ আজও পুরাতন হইল না। রামচন্দ্র রাজা ছিলেন—বাল্মীকির এই অপরাধ 'নবীন'গণ আর কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। কিন্তু বাল্মীকি কি রামচন্দ্রের রাজত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি রামচন্দ্রের যে দুঃখের কথা বলিয়াছেন তাহা কোন্ মানুষের দুঃখ নয়? রামচন্দ্রের সঙ্গে যে-জায়গাটায় সকল মানবের মিল সেখানে রামচন্দ্র অসাধারণ নন, সেখানে তিনি সার্বজনীন, সেখানে তাঁহার

দরিদ্রতম প্রজার সঙ্গে তিনি অভিন্ন। এই সার্বজনীন অভেদে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যেই আদি কবিকে পূর্বোল্লিখিত ত্রিস্তরের অতীত মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ক্রৌঞ্চের মধ্যে তিনি যেমন বিশুদ্ধ জীব-করুণাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন ত্রিস্তরাতীত রামচন্দ্রের মধ্যে তেমনি তিনি বিশুদ্ধ মানব-করুণাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মানুষের কথা মানুষ শুনিতে চায় বলিয়াই রামায়ণ-কাব্য মনে রাখিয়াছে, ইহা দরিদ্রের কথা হইলে দরিদ্রেও ইহা মনে রাখিত না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, রাজার মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ মানবরূপ আছে, দরিদ্রের মধ্যেও তো তেমনি বিশুদ্ধ মানবরূপ সম্ভব, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাব্য লিখিলে কি চলিত না? অবশ্যই চলিত। কিন্তু দরিদ্রের বিশুদ্ধ মানবরূপ লইয়া কাব্য লিখিলে দারিদ্র্যের কথা তাহাতে থাকিত না, কাজেই তাহাকে দরিদ্রের কথা আর বলা যায় কি প্রকারে? দরিদ্রের মধ্যে যে চিরকালীন মানুষ তাহার সঙ্গে রামচন্দ্রের মধ্যেকার চিরকালীন মানুষের প্রভেদটা কোথায়? কাজেই ও দুই এককথাই হইল। তাহা ছাড়া কাব্যেরও একটা দাবী আছে। মহাকাব্য রচনার ভারত-জোড়া শিবির স্থাপন করিতে গেলে শক্ত, বৃহৎ ও সুউচ্চ স্তম্ভের আবশ্যক। তৎকালীন পরিবেশে অযোধ্যার রাজবংশই ছিল সেই স্তম্ভ। কিন্তু রাজবংশের মাহাত্ম্য বর্ণনা নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না—ইহা উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষের সুখদুঃখের কথা বলিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখা। সে উদ্দেশ্য যে তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে ইহা বোধ করি 'নবীন'গণ স্বীকার করিবেন।

এবারে পূর্বতন সাহিত্যিক জাতিস্মরতার প্রসঙ্গে আবার ফিরিয়া আসা যাক্। সাহিত্যে জাতিস্মরতা ঘটিবার প্রধান কারণ দুইটি। ঘটনার সমকালে তাহাকে সাহিত্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে পরিপ্রেক্ষিতের দোষে বা অভাবে তাহা শিল্প না হইয়া জর্নালিজম মাত্র হইতে পারে। ঘটনাটির যথার্থ

স্বরূপ দেখিবার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। ঠিক কতটা সময় দরকার তাহার নিয়ম নাই; তাহা ঘটনার গুরুত্ব ও লেখকের প্রতিভার উপরে নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' স্বদেশী আন্দোলনের শিল্পরূপ। স্বদেশী আন্দোলনের অত্যল্পকাল পরেই এই উপন্যাস রচিত। লেখকের ঘটনা-স্বরূপ দেখিবার অসামান্য ক্ষমতার বলে এখানে দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসও বাঙালী সমাজের বিশেষ একটি অবস্থার শিল্পসম্মত জন্মান্তর। এখানেও পরিপ্রেক্ষিত স্বল্পকালের। অবান্তর তথ্য অতিক্রম করিয়া তত্ত্বে উপনীত হইবার অসাধারণ ক্ষমতাই দুই স্থানে শিল্পকে জর্নালিজমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন লেখকের 'ঋষি-দৃষ্টি'র। এই ঋষি-দৃষ্টি প্রতিভাবান্ লেখকমাত্রেরই থাকে। কাহারো বেশি, কাহারো কম। এই ঋষি-দৃষ্টির দ্বারা সাহিত্যিক নিছক জর্নালিস্ট হইতে ভিন্ন। এই সহজাত ঋষি-দৃষ্টি বাড়িতে পারে লেখক যদি নিজের সত্তাকে দেশের ঐতিহ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে পারেন। তজ্জন্য সাধনার আবশ্যক।

গাছ কতকগুলি শিকড় দিয়া নিজেকে মাটির উপরে বিধৃত করিয়া রাখে—আবার মূল শিকড় দিয়া গভীর হইতে রসাকর্ষণ করিয়া নিজেকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক লেখকেরই শক্তির অনেকটা যায় সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে—অধিকাংশেরই মূল শিকড় ক্ষণিকতার স্তর ছাড়াইয়া গভীরে প্রবেশ করে না। কাজেই তাহারা যে-রস পান করিয়া সঞ্জীবিত তাহা প্রায়শ ক্ষণিককালের। চিরকালের রস-প্রবাহ নিম্নতর স্তরে বর্তমান। ইহাই দেশের ঐতিহ্য। এইখানে শিকড় প্রেরণ করিতে না পারিলে এমন সাহিত্য রচনার আশা থাকে না—যাহা দেশের সমস্ত অস্তিত্বকে আন্দোলিত করিতে সমর্থ। বাঙলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ দেওয়া যাক্। মধুসূদনের প্রথম শ্রেণীর শিল্পক্ষমতা ছিল। তাঁহার প্রতিভার প্রচণ্ড আবেগ বাঙলা সাহিত্যে

অসাধ্য সাধন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি দেশের ঐতিহ্যের সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে পারেন নাই। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর প্রতি তাঁহার আসক্তি নিতান্তই শিল্পীর আসক্তি। বিদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁহার যোগ দেশীয় ঐতিহ্যের যোগের চেয়ে গভীরতর। বিদেশীয় রসে তিনি দেশীয় কাহিনীকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। দেশের ঐতিহ্যের পরিচয় ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে শিল্পক্ষেত্রে বারংবার বিদেশী নজির খুঁজিতে হইয়াছে। তাঁহার সব কাব্যই বিদেশী 'মডেলে' গঠিত। বিদেশের মডেলের নজিরকে অতিক্রম করিয়া কিছু রচনা করিবার সামর্থ্য তাঁহার হয় নাই। দেখা যাইতেছে, দেশের ঐতিহ্যের রসে তাঁহার পুষ্টি সাধিত হয় নাই বলিয়াই তিনি শিল্পীমাত্র হইয়াছেন। ব্যাপকভাবে, গভীরভাবে দেশের চিত্তকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে আন্দোলিত করিবার ক্ষমতার ঐকান্তিক অভাব তাঁহার কাব্য-দৃষ্টিতে। মধুসূদন সাহিত্যিকদের মাত্র কবি।

তাঁহার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিলে প্রভেদটা বেশ চোখে পড়িবে। ইঁহাদের দুজনের মধ্যেই বিদেশীয় প্রভাব আছে—কিন্তু তাহা নিতান্ত বাহ্য-ব্যাপার। এই দুই বিরাট বনস্পতির মূল শিকড় দেশের প্রাচীনতর স্তরে, নিত্য রসপ্রবাহের স্তরে নিমজ্জিত হইয়া রসপান করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সেই স্তর গীতা ও মহাভারত, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উপনিষদ ও কালিদাস। দেশের ঐতিহ্যকে তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বিদেশী ঐতিহ্য তাঁহাদের রচনায় এমন ফলপ্রসূ হইয়াছে। Charity-র মতো 'কালচারের'ও সূত্রপাত স্বগৃহে। স্বগৃহ সত্য না হইলে পরগৃহ কখনও সত্য হয় না। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে যতই নিন্দিত হোক না কেন—তাহাদের প্রধান তাৎপর্য এই যে, এগুলিতে দেশের ঐতিহ্যের উপরে বিদেশের রাজনৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সেইজন্যই এ দুখানা বই দেশের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেশীয় ঐতিহ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে অচেতন কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহা লিখিত হইবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না,

কিংবা সে রকম কোন গল্প লিখিত হইলেও তাহা শিল্পমাত্র হইত—তাহার বেশি কিছু নয়। ভারতীয় জীবনতত্ত্বের স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গোরা, সাময়িক ঘটনার বিবৃতি হইয়াও চিরসাময়িক। বাস্তবের রূপান্তরের কথা পূর্বে বলিয়াছি। রূপান্তরের অর্থই সাময়িককে চিরসাময়িকের জলে অভিষেক। এই জল লেখকের মন-বৈতরণীর জল। এই বৈতরণীর উৎস দুইটি। দেশের ঐতিহ্য ও লেখকের প্রতিভা।

আমাদের আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রতিভা অনেকেরই আছে। কিন্তু 'ঋষি-দৃষ্টি', অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া ঘটনার স্বরূপকে দেখিবার ক্ষমতা, কাহারো নাই বলিলেই হয়। এই ক্ষমতার অভাব তাঁহারা পূরণ করিতে চান কেবল ঘটনার চতুর বিন্যাসের দ্বারা কিংবা বিদেশের ধারকরা তত্ত্বের দ্বারা। ঘটনার বিন্যাস যতই চতুর হোক তাহা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য নয়; আর ধারকরা তত্ত্বের দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার হওয়া অসম্ভব। ফলে বাস্তব বাস্তবই থাকিয়া যাইতেছে, তাহার রূপান্তর ঘটিতেছে না এবং সাহিত্যিক জাতিস্মরের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। আর সবচেয়ে আশঙ্কার কথা এই যে, আমাদের লেখকগণ এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন পর্যন্ত নন, বরঞ্চ জাতিস্মরতাকেই তাঁহারা সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া বাছিয়া লইয়াছেন। পাঠক ও প্রকাশকের তাগিদে অন্তরের বৈতরণীর কলধ্বনি আর তাঁহাদের কানে প্রবেশ করে না। একবার তাঁহারা স্থিত-ধী হইয়া দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন কি? নতুবা দেশের প্রতি সমবেদনা সত্ত্বেও ক্ষণিক জর্নালিজম মাত্র সৃষ্টি করিয়া শেষ পর্যন্ত দেশকে তাঁহাদের সাহিত্যিক ক্ষমতা হইতেই বঞ্চিত করিবেন।

মেজরিটি ও মাইনরিটি

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গ্রন্থে ব্রাহ্মণ নামে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে তিনি সমাজে ব্রাহ্মণের কর্তব্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ-ব্রাহ্মণ সমাজের সেই মুষ্টিমেয় জ্ঞানী-ব্যক্তি যাঁহারা মনুষ্যত্বের আদর্শকে সমাজের পাত্রে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সমাজে সমাজে, দেশে দেশে ও কালে কালে ভেদ আছে। মনুষ্যত্বের আদর্শ সর্ব দেশে, সব কালে সমান। মনুষ্যত্বের আদর্শ ও সমাজের আদর্শে যাহাতে বিরোধ না বাধে, যাহাতে সমন্বয় ঘটে, তাহাই ছিল ব্রাহ্মণের লক্ষ্য, আর সেই আদর্শকে কর্মের দ্বারা আচরণ করিয়া সজীব আকার দান করা তাঁহাদের কর্তব্য। এই অত্যাবশ্যক কাজটি তাঁহারা করিতেন বলিয়াই আমাদের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে আদর্শ ব্রাহ্মণের একটি মহৎ মর্যাদা ছিল। এখন আর সে ব্রাহ্মণ নাই, সমাজের কাঠামো বদলিয়া গিয়াছে, কাজেই ব্রাহ্মণত্ব এখন আর কোন আদর্শের প্রতীক নয়, কেবল একটা নিরর্থক ছাপ মাত্র।

এই ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ইহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ্য, সেই সম্মান দেয়। ইঁহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি। ইঁহারা যে সমাজে আপনাকে মুক্তভাবে রাখেন, ক্ষুদ্র পরাধীনতায় সে সমাজের কোন ভয় নাই, বিপদ নাই। ব্রাহ্মণ-অংশের মধ্যে সে সমাজ সর্বদা আপনার মনের, আপনার আত্মার স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে।"

কিন্তু—

"যে ব্রাহ্মণ সাহেবের আফিসে নতমস্তকে চাকরি করে, যে ব্রাহ্মণ আপনার

অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান অধিকারকে বিসর্জন দেয়, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক, বিচারালয়ে বিচারব্যবসায়ী, যে ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে ধিক্কৃত করিয়াছে, সে আপন আদর্শ রক্ষা করিবে কি করিয়া, সমাজ রক্ষা করিবে কি করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাহার নিকট ধর্মের বিধান লইতে যাইব কি বলিয়া? সে তো সর্বসাধারণের সহিত সমানভাবে মিশিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িয়া গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—সমাজের বর্তমান ব্যবস্থার ফলে ব্রাহ্মণ তাহার ব্রাহ্মণ্য হারাইয়াছে। কিন্তু এক কালে, সমাজকর্তারা যখন সজীব ছিল যথার্থ ব্রাহ্মণের তখন অভাব ছিল না। তাই বলিয়া সমাজের প্রত্যেকটি লোক যে এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল এমন মনে করিলে ভুল হইবে। মুষ্টিমেয় একদল লোক এই আদর্শের ধারক ছিল। একটি সমাজকে রক্ষা করিতে এক মুষ্টিই যথেষ্ট। কিন্তু তাহাদের আদর্শবাদ সত্য ও অকৃত্রিম হওয়া আবশ্যক। কারণ সত্য গুণগত, সংখ্যাগত বা মাত্রাগত নয়।

বলা বাহুল্য যে, এই ব্রাহ্মণত্বের সহিত জাতিগত ব্রাহ্মণের কোন সংশ্রব নাই। যিনি জ্ঞানের দ্বারা, আদর্শের প্রেরণার দ্বারা সমাজকে চালনা করেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথ-কথিত ব্রাহ্মণ। তিনি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, আবার না করিলেও ক্ষতি নাই, কর্মের দ্বারাই তিনি ব্রাহ্মণ। এই বিচারের মানে পণ্ডিত জওহরলাল ব্রাহ্মণ, ব্রজেন্দ্র শীল ব্রাহ্মণ, আর মহাত্মা গান্ধী তো ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শব্রাহ্মণ-তত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজে একদল লোক থাকিবেন যাঁহারা সামাজিক আদর্শের ধারক। স্বভাবতই সংখ্যায় তাঁহারা স্বল্প, কিন্তু আদর্শের গৌরবে গরীয়ান বলিয়াই গুণের বিচারে তাঁহারা গরিষ্ঠ। এই সংখ্যাল্পসম্প্রদায়ের চালনায় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চালিত হইবে। ইহাই সমাজধর্মের সাধারণ নিয়ম।

এখন আমরা সমাজের এই সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু অংশদ্বয়কে কাজের সুবিধার জন্য মাইনরিটি ও মেজরিটি বলিয়া উল্লেখ করিব।

সামাজিক মেজরিটি শক্তিমান, সামাজিক মাইনরিটি চক্ষুষ্মান্। মেজরিটির শক্তি এবং মাইনরিটির জ্ঞান—এই দুই বস্তু যে সমাজে সুষ্ঠুভাবে মিলিত হয়, সে সমাজে কল্যাণের পথ প্রশস্ত বলা যাইতে পারে। এ দুইয়ের বিরোধ, বা একটির প্রতি অপরের অনাস্থা বা অশ্রদ্ধা সমাজের বিনাশের কারণ।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, সমাজে 'ব্রাহ্মণে'র সংখ্যা স্বভাবতই অল্প—'ব্রাহ্মণ' সর্বকালে সর্বসম্প্রদায়ে সংখ্যাল্প। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; যেহেতু চালকের সংখ্যা, চালিতের সংখ্যার চেয়ে অল্পই হইবে, একজন চালকের আদেশেই একটা বিরাট বাহিনী যাত্রা আরম্ভ করিয়া থাকে।

কিন্তু এই স্বল্পতারও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। মাইনরিটি এই নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম হইয়া পড়িলে সমাজ-চালনার ক্ষমতা আর তাহার থাকে না, মেজরিটি তখন তাহার আধ্যাত্মিক প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যায়। যদি কোন সমাজে 'ব্রাহ্মণে'র সংখ্যা এমন কমিয়া আসে, যখন সে আর সমাজকে মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে অক্ষম, বুঝিতে হইবে সেই সমাজের মৃত্যু প্রায় আসন্ন।

ম্যাথু আর্নল্ড 'Numbers' নামে প্রবন্ধে এই সমস্যাটি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে তিনি মেজরিটি ও সংখ্যালঘু অংশকে Remnant বা অবশিষ্টাংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, কোন সমাজের সংখ্যালঘু অংশ কোন কারণে লঘুতর হইয়া পড়িলে সমাজকে আর প্রভাবিত করিতে পারে না, ফলে সর্বনাশের পথ প্রস্তুত হয়। তাঁহর মতে এই অনুপাতহ্রাসের ফলেই প্রাচীন কালের ধীমান্ জাতিসমূহের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। তিনি বিশেষভাবে এথেন্স-রাষ্ট্র, য়িহুদি-রাষ্ট্রের নাম করিয়াছেন। এথেন্স-রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষের অধিক ছিল না, য়িহুদি-রাষ্ট্রের দশ লক্ষের কাছাকাছি। এখনকার তুলনায় এই সব

রাষ্ট্রকে জনসংখ্যার বিচারে নগণ্য বলিতে পারা যায়। এক কলিকাতা শহরের জনসংখ্যা য়িহুদি-রাষ্ট্রের চতুর্গুণ। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা এথেন্স-রাষ্ট্রের চেয়ে অধিক বই কম নয়। এই দুই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সামান্য জনসংখ্যা যথেষ্টসংখ্যক 'ব্রাহ্মণ' সৃষ্টি করিতে পারে নাই; এই সামান্য মেজরিটিকে চালনা করিতে যে মুষ্টিমেয় মাইনরিটির আবশ্যক তাহার উদ্ভব সেখানে সম্ভব নাই বলিয়াই অন্যথা প্রভাবশালী রাষ্ট্রদ্বয় কালক্রমে ধ্বংস পাইয়াছে। যে গ্রীস ইউরোপীয় সভ্যতার জনক, সে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। যে অর্জুন মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর তিনি কতকগুলি বর্বরের হাতে পরাজিত হইয়াছিলেন। কেবল আদর্শই যথেষ্ট নয়, আদর্শবানের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক। মাইনরিটি একটা সংখ্যার নিচে নামিলে বীর্যহীন হইয়া পড়ে।

ম্যাথ্যু আর্নল্ড পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, আধুনিক জাতিসমূহের সুবিধা এই যে, জনসংখ্যার পরিসর ইহাদের প্রচুর। কাজেই অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিলে আধুনিক সমাজে এমন বৃহৎ মাইনরিটি সৃষ্টি করা যায় যে, সেই মাইনরিটি মেজরিটিকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম। কাজেই, অবস্থান্তর বা ইচ্ছান্তর না ঘটিলে, আধুনিক জাতিসমূহ এমন দীর্ঘ ও সার্থক জীবন লাভ করিতে পারে, প্রাচীন কালের জনসংখ্যাল্প জাতিসমূহের পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল না। এইখানেই প্রাচীন জাতিসমূহের তুলনায় আধুনিক জাতিগুলির মস্ত একটা সুবিধা। জাতি-জীবনকে দীর্ঘায়িত করিবার উপায় তাহার হাতেই রহিয়াছে, সেই উপায়কে সে অবলম্বন করিবে কি না তাহা তাহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে।

২

এবারে রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণতত্ত্ব ও ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সংখ্যাতত্ত্ব বাঙালীর জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, একবার দেখা যাক্। একথা আজ অস্বীকার কবিবার উপায় নাই যে, বাঙালীর

জীবনে একটা সর্বাত্মক অধোগমনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত বাস্তববিমুখ, মূঢ় ও আত্মতোষণপরায়ণ রাজনীতিক ব্যতীত সবাই স্বীকার করিবেন যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালী আজ পরাজিত এবং পরাজিতের মনোভাবসম্পন্ন। প্রতিভাশালী বাঙালীর সংখ্যা যদি একটা পর্বে অল্প হয় তাহাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা, প্রতিভাশালী পূর্বজগণের প্রভাব সমাজে সার্থক সক্রিয়তা লাভ করিতেছে কি না। তাহা যদি না হয়, তবে প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রতিভার সুফল হইতে সমাজ বঞ্চিত হয়। তাহা ছাড়া কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমাজকে বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিতে পারে না। প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং সমাজের নিম্নতম অশিক্ষিত স্তরের মধ্যে মানসিক মধ্যবিত্ত বলিয়া একটা সুবৃহৎ সম্প্রদায় আছে। সমাজের জীবনসত্তা অনেক পরিমাণে তাহাদের উপরেই নির্ভর করে। যে মানসিক মাইনরিটির উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের অধিকাংশেরই উদ্ভব এই স্তর হইতে। সমাজে প্রতিভাশালীর সংখ্যা কমিয়া গেলে ক্ষতি নাই যদি এই স্তরটি সজীব ও সক্রিয় থাকে। প্রতিভাশালীর প্রতিভা ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া যায়। এই স্তরটি সমাজের মন বা বুদ্ধি। যখন কোন জাতির অধঃপতনের সময় উপস্থিত হয়—এই স্তরে ঘুণ ধরিয়া ওঠে। আমার বিশ্বাস, বাঙালী সমাজের এই স্তরে বৈকল্য দেখা দিয়াছে। আর যে মাইনরিটিকে সমাজ-মনের নেতা বলিয়াছি তাহার উদ্ভবের প্রধান কেন্দ্র এই স্তর। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, কেবল মাইনরিটি নয়, মাইনরিটির উৎসই আজ শুষ্ক। নদী যে জলহীন তাহার কারণ উৎসমূলে জলের অভাব।

অনেকে বলিবেন, এমন সর্বাত্মক অভাবের সর্বব্যাপী লক্ষণ কোথায়? লক্ষণ সব সময়ে স্পষ্ট হয় না। অনেক সর্বনাশ আছে, যাহা শেষ দশায় উপস্থিত হইলে তবেই বুঝিতে পারা যায়। প্লেটো একস্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার এথেন্স-রাষ্ট্রে চারিদিকে যখন সমৃদ্ধি ও সুশাসনের চিহ্ন, তখনই তিনি রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তী ধ্বংসের বীজের সুনিশ্চিত চিহ্ন দেখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে,

তাঁহার সমকালীন এথেন্সে যুবক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল নগরনটীদের বিলাসকলা এবং রসনা-পরিতোষকর খাদ্যের রন্ধনশিল্প। অবশ্য তাঁহার সমকালীন কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, আপাতসমৃদ্ধির মধ্যে এ দুটি মৃত্যুর বীজ।

কিছুকাল পূর্বে নোয়াখালিতে যখন অমানুষিক কাণ্ড চলিতেছিল, সংবাদ-পত্র যখন দুর্গতের বর্ণনায় পূর্ণ, তখনো কলিকাতার ট্রামে বাসে শিক্ষিত ব্যক্তিদের (ফরসা জামা কাপড় পরিহিত বলিয়াই শিক্ষিত!) আসন্ন ছায়া-চিত্রের নাগরীদের অপাঙ্গ বিশ্লেষণ করিতে শুনিয়াছি। অফিস-প্রত্যাগত পলিতকেশ বৃদ্ধকে অতিশয় ব্যগ্র মনোযোগের সহিত এমন অপদার্থ রচনা পড়িতে দেখিয়াছি, যে বই লিখিতে বা পড়িতে কোন বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না ; অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের মধ্যে পরিষ্কার বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে— কেহ কাহারো কাছে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করে না। ইহাতে উভয়ত চিত্তের অসাড়তা প্রমাণ হয়। আর প্রথম দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে চিত্তের বাস্তববিমুখতা।

বাঙালী সমাজের মুমূর্ষার পরিচয় তাহার জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দেশের হাতে এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা আসিয়াছে দেখিয়া সে ক্ষমতাকে নিজ নিজ দলের হাতে টানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী কি লজ্জাকর ও মারাত্মক রেষারেষিই না চলিতেছে। যেখানে যত মর্চে-ধরা রাজনীতিক ছিল, সকলে ক্রমে ক্রমে রাজনীতির ক্ষেত্রে আসিয়া আত্মপ্রচার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। দলের আত্মপ্রতিষ্ঠার পায়ে দেশের স্বার্থ নিত্য উৎসর্গীকৃত হইয়া চলিয়াছে। দলীয় নেতাদের কাছে দলই দেশ। দেশ ও দশ নয়, দেশ ও দল, অনেক দলে আবার দশজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ! এই দলীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার চরম দণ্ড এখনি আসিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। দেশ এখন সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে ব্যস্ত, তাই দলীয়তাবাদ এখনো তাহার চরম উগ্রতা প্রকাশ করে নাই। একবার এই দাঙ্গার অবসান হইলে দলীয়তা-বাদ সন্ত্রাসবাদে পরিণত হইবে না, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দৃষ্টান্তই লওয়া যাক না কেন! প্রথম অতর্কিত আক্রমণের ফলে লোকে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল, মানব-স্বভাবের ইহা সাধারণ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু শেষ দিকে কেহই আর দাঙ্গা চাহিতেছিল না—কিন্তু থামিতেছিল না, থামাইবে কে? থামাইবার কথা বলিবে কে? যে চিন্তাশীল মাইনরিটি সমাজকে প্রভাবিত করে, সেই মাইনরিটি যে অক্ষম, অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে দু'চার জন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, ভবিষ্যদ্দর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। চিন্তাশীলতা যতই মূল্যবান সম্পদ হোক, সংখ্যারও একটা গুরুত্ব আছে। সেই গৌরব আজ কোথায়?

একজন পাঞ্জাবী ব্যক্তিগত কলহের পরিণামে একজন বাঙালীকে হত্যা করিলে বাঙালী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ পাঞ্জাবী সমাজের বিরুদ্ধে বিচলিত হইয়া উঠিবে—ইহার মধ্যে বিচারের লক্ষণ কোথায়? কিংবা যখন সশস্ত্র বাঙালী যুবকেরা দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে জগৎপূজ্য মহাপুরুষকে অপমান ও আক্রমণ করে—তখন, তখনো যে ব্যক্তি জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করে, হয় সে নির্বোধ, নয়, যে কথা সে বলিতেছে তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সে অচেতন।

এমন যে হইতেছে তাহার প্রধান কারণ—মাইনরিটি মেজরিটির নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। যে সমাজে এমন হয় তাহার মৃত্যুদণ্ড অদৃষ্ট কর্তৃক প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। প্লেটো সক্রেটিসের আবির্ভাবও তো গ্রীক সমাজকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

আর যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মাইনরিটির অনুপাত পূর্ববৎ আছে—তবু নিশ্চিন্ত হইবার কারণ নাই। যেহেতু গত পঞ্চাশ বৎসরে জাতির জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, সাক্ষরতার সংখ্যা বাড়িয়াছে,—কিন্তু যে বুদ্ধি সকল সম্পদের মূল কারণ, সেই মাইনরিটির সংখ্যা মেজরিটির অনুপাত রক্ষা করিয়া বাড়ে নাই।

মুসলমান সমাজে এই মাইনরিটির সংখ্যা আরও অল্প—নাই বলিলেই চলে। সেইজন্য কোন মুসলমান নেতা একটি আদেশ প্রচার করিলে তাহা

বিনা প্রতিবাদে পালিত হয়। এই নির্বিচার পালনকে আমরা নিয়মানুবর্তিতার লক্ষণ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু যে নিয়মানুবর্তিতা চিন্তাশীলতার অভাব হইতে উদ্ভূত তাহা সময়োপযোগী হইতে পারে, বাস্তব স্বার্থসিদ্ধির কারণ হইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রশংসার যোগ্য নয়। মানুষের নিয়মানুবর্তিতা সজ্ঞান বিচারের ফল, নতুবা তাহা পাশব অভ্যাসমাত্র। মুসলমান সমাজে মাইনরিটি যতদিন না প্রবল হইয়া দেখা দিতেছে, হিন্দুসমাজে মাইনরিটি যতদিন না প্রবলতর হইতেছে, ততদিন হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে না। মেজরিটির শাসন কুশাসন, তাহা জুলুম মাত্র, মাইনরিটির অনুশাসনেই জাতির মুক্তির পন্থা। আজ সব সমাজে—কি হিন্দু, কি মুসলমান—সেই বুদ্ধিবৃত্ত অনুশাসনের ঐকান্তিক অভাব, তৎপরিবর্তে যাহা আছে—তাহা অন্ধতার, অজ্ঞতার, নিছক সংখ্যা-গৌরবের শাসন মাত্র। কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধিতেও দেশের যথার্থ মুক্তি নয়, কারণ রাজনীতির মূলেও আছে মাইনরিটির চিন্তাশীলতা। যে দেশের রাজনীতি সেই চিন্তাস্রোত হইতে বঞ্চিত, সে রাজনীতি একপ্রকার গুণ্ডামিমাত্র, তাহার নাম ও রূপ যাহাই হোক না কেন!

বাঙালী সমাজে চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ্যাহ্রাস আজ আমাদের সম্মুখে সবচেয়ে সঙ্কটজনক সমস্যা। ইহার প্রতিকারের উপায় কি? জাতির চিন্তাশীলতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ্যা দুই-ই বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। জাতির চিন্তাশক্তি গভীরতায় ও ব্যাপকতায় না বাড়িলে, অন্ত হইতেই না বাড়িতে থাকিলে, আগামী কল্য আমাদের কাছে অর্থহীন। অবশ্য সমস্ত সভ্য দেশেই আজ মেজরিটি ও মাইনরিটির এই অনুপাত-বৈষম্য দেখা দিয়াছে, কোন দেশেই মেজরিটি আর সম্পূর্ণত মাইনরিটির অনুশাসনের বাধ্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে একপ্রকার নব্য বর্বরতার অভিযান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই নজিরের বলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না—বরঞ্চ উদ্বেগের কারণ বাড়িয়া যায়। মাইনরিটির অনুপাতবৃদ্ধি আবশ্যক,—কিন্তু তাহারও আগে আবশ্যক—এই অনুপাত-বৈষম্য সম্বন্ধে চৈতন্য। অনুপাতবর্ধনের ইহাই প্রথম ধাপ।

আমরা এখনো এই প্রথম ধাপটি সম্বন্ধেই সচেতন নহি। অবিলম্বে সে চেতনার আবশ্যক। এই প্রবন্ধ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে কিনা জানি না—তৎসত্ত্বেও বলা আবশ্যক। যদিচ সুফলের আশা করিয়া কাজ করিবার বা কথা বলিবার স্থান বাঙলা দেশ নয়।

বাঙালী-সমাজের পরিণাম

অনেকে আমাকে অহৈতুক-নৈরাশ্যবাদী বলিয়া অপবাদ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, গোরুর পালে বাঘ না পড়িতেই আমি সোরগোল তুলিয়া পাড়া বিচলিত করিবার অনুরূপ করিতেছি। কিন্তু বাঘ পড়িবার পরেও লোক না ডাকা এবং বাঘ পড়িবার আগেই লোক ডাকিবার মধ্যে শেষোক্ত পন্থাই অধিকতর নিরাপদ। কিন্তু ইহার পরিণাম কি শোচনীয় হওয়া সম্ভব নয়? অকারণ ডাকাডাকিতে লোক বিরক্ত হইয়া পড়িলে সকারণ আহ্বানে লোকে কি আর আসিবে? কথামালা যাহাই বলুক, লোকে আসিতে কখনই দ্বিধা করিবে না; সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে না আসুক, বাঘে কি-ভাবে একটা আস্ত গোরু খায়, অন্তত সে তামাসা দেখিবার জন্য লোকের কখনো অভাব হইবে না। কাজেই আমি যদি ভুল করিয়াই থাকি, তবে মারাত্মক নয়। অতি-বিশ্বাসের চেয়ে নৈরাশ্যের দিকে একটু হেলিয়া চলাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ! যে দিনকাল পড়িয়াছে, অন্তত নৈরাশ্য-ব্রত গ্রহণ করিলে ব্রতধারীর ঠকিবার আশঙ্কা নাই।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালী-সমাজের প্রতি সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। তখন সকলে (অর্থাৎ যাহারা সেই সব রচনা পড়িবার কষ্ট সহ্য করিয়াছিল) বলিয়াছিল যে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আশায় আমি চন্দ্রমণ্ডলে অমাবস্যার রঙ বুলাইতে সুরু করিয়াছি। আমার সমালোচকদের ভাবটা এই যে, সত্য কথা বলিবার সাহস বা বুদ্ধি না থাকাতে লেখক অর্ধ-সত্য আমদানি করিয়া আসর জমাইবার চেষ্টায় আছে। আমার সমালোচকদের এই অবিশ্বাসের হেতু তখনো বুঝিতে পারি নাই, এখনো বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙালী-সমাজের ধ্বংস অনিবার্য

শুধু নয়, আসন্ন—এমন কি ধ্বংসের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আমরা সচেতন নই বটে, কিন্তু তাহাতে সত্যের বিকার ঘটে না। শোনা যায় যে, জলে ভাসমান ব্যক্তির নিম্নাঙ্গ হাঙরের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায় দেহ হইতে ছিন্ন হইয়া গেলেও লোকটা বুঝিতে পারে না, কিন্তু জল হইতে ডাঙায় উঠিবামাত্র মারা পড়ে। বাঙালী-সমাজেরও অর্ধাঙ্গ ইতিমধ্যেই দেহচ্যুত হইয়াছে—তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, ভাসমান ব্যক্তির মতো নিম্নাঙ্গ নয়, বিনশ্যমান ব্যক্তির মতো উত্তমাঙ্গ।

তখন বলিয়াছিলাম যে, বাঙালী-সমাজ অচিরকালের মধ্যে য়িহুদিজাতির দশা প্রাপ্ত হইবে। দেশে তাহার স্থান হইবে না, বিদেশে সে অনুগৃহীত জীব হইবে, স্থায়ী বাসস্থান সে পাইবে না, এইভাবে ভিতরের তাড়ায় এবং বাহিরের অবহেলায় তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। প্রবাসী বাঙালী-সমাজকে বলিয়াছিলাম, তাহারা যদি সত্যই মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তবে অবিলম্বে স্বেচ্ছাকৃত প্রবাস-দশা ঘুচাইয়া প্রবাসভূমিকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; বৃথা 'সোনার বাঙলা, সোনার বাঙলা' বলিয়া খেদ করিয়া লাভ নাই। প্রবাসী বাঙালী-সমাজকে বলিয়াছিলাম, যে-বাঙালী ও যে-বাঙলার জন্য তাহারা অকারণ মমত্ববোধ করিয়া থাকে, তাহা বাস্তব নয়, ডেপুটি সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। বস্তুগত বাঙলাদেশ এমনই অসহায় যে, নিজেকে রক্ষা করিবার শক্তিই তাহার নাই, প্রবাসী বাঙালীসমাজ কোনপ্রকার সাহায্য যেন তাহার নিকটে আশা না করে।

এসব মন্তব্য অল্পাধিক দশ বৎসর আগেকার ব্যাপার। আজ দেখিতেছি এবং আশা করি নিতান্ত অন্ধ বা ভাবান্ধ ব্যতীত সকলেই দেখিতে পাইতেছে যে, বাঙালী-সমাজ আমার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। আজ প্রবাসী বাঙালী-সমাজ আসামী, ওড়িয়া, বিহারী, মাদ্রাজী ও পাহাড়ী সমাজের হাতে মার খাইতে খাইতে অভিমন্যুর দশা পাইতে চলিয়াছে। স্বদেশবাসী বাঙালীকে মারিবার পক্ষে একক মুসলমানই যথেষ্ট। বাঙালী

আজ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া দাবানলভীত মৃগযূথের মতো স্থানান্তরে চলিয়াছে। প্রবাসী বাঙালী-সমাজের পক্ষে আজ তাহাদের প্রবাসভূমি মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সোনার বাংলায় ফিরিবার সাহস আজ আর তাহার নাই, এবং ফিরিলে দেখিতে পাইবে স্থানও নাই।

ইহাই কি আজ বাস্তব-অবস্থা নয়? যদি কেহ এই অবস্থাকে দশ বৎসর আগে দেখিয়া থাকে তবে কি তাহাকে দোষ দেওয়া উচিত? দৃষ্টির স্বাভাবিকতা বা উৎকর্ষ অপরাধ নয়। কিন্তু বাঙালী-সমাজের দুর্গতির এখানেই শেষ নয়, বরঞ্চ সূত্রপাত। ইহা সবে কলির সন্ধ্যা। অত্যল্প কালের মধ্যে বাঙালী-সমাজের পরিণাম কি শোচনীয় অবসানে গিয়া পৌঁছিবে তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র দিতে চেষ্টা করিব। আসন্ন ভবিষ্যৎ আমার চিত্রের একমাত্র সাক্ষী। তবে এবারে হয়তো দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। পতনের বেগ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। প্রথম পর্বটাকে অশেষ মনে হইলেও শেষ পর্বটাতে বিশেষ সময় লাগে না।

২

প্রথমেই বলিয়া রাখি—আমি রাজনীতিক নই। রাজনীতিকগণ যে-সব তথ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন সে-সব তথ্য হয়তো আমাকেও ব্যবহার করিতে হইবে—কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। অব্যবহিত ফললাভই রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য। জাতির সংস্কৃতির বিচার করিতে বসিলে হাতে হাতে ফল লাভ করিবার আশা চলে না। আরও একটা বিষয় পূর্বাহ্নে বলিয়া রাখিতে চাই, আমি মুসলমান-বিদ্বিষ্ট নই। একটা লোককে ঘৃণা করিতে পারি, কিন্তু একটা সুবৃহৎ সমাজকে ঘৃণা করিতে হইলে হৃদয়ের যে-পরিমাণ উদারতার আবশ্যক, আমাতে তাহার একান্ত অভাব। এই আলোচনা-প্রসঙ্গে এমন অনেক তথ্য ব্যবহার করিতে হইবে যাহার টানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস আপনি আসিয়া পড়িবে, কিন্তু বিদ্বেষ প্রকাশ বা বিদ্বেষ প্রচার তাহার উদ্দেশ্য নয়।

আমাদের আলোচনার বিষয় বাঙালী-সমাজের আসন্ন পরিণাম।

ভৌগোলিক বিচারে বাঙলাদেশ আড়াই টুকরা হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ—এই দুই টুকরা, আর পশ্চিম বঙ্গের সহিত সংলগ্নতাহীন জলপাইগুড়ি ও দারজিলিং জেলাকে অর্ধ টুকরা বলা যাইতে পারে—ইহাকে বলা যাক্ পার্বত্য বঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গের সহিত সংস্পর্শহীনতার ফলে অচিরকালে এই অর্ধখণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্যে বা প্রদেশে পরিণত হইলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; যেহেতু পাহাড়ী জাতিরা ইতিমধ্যেই সেইরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছে।

ইহা ছাড়া বাঙলা দেশের আর একখণ্ড বহুদিন হইল বিহার প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া আছে—ইহাকে বলা যাক্ বিহারী বঙ্গ। অবশ্য মানভূম, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণাকে বাঙলা দেশে ফিরাইয়া আনিবার দাবী হইয়াছে। কিন্তু এ দাবী তুলিয়াছে কে? বাঙলা দেশের বাঙালী সমাজ। ওই অঞ্চলের সাধারণ বাঙালী-সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই দাবী দেখা দিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বিহারী-বঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে বাঙলায় ফিরিবার দাবী করেন বটে, তবে তাহা কতখানি আন্তরিক আর কতখানি 'ভীতিপ্রদর্শন' করিয়া বিহার সরকারের নিকট হইতে বিশেষ সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে বলা যায় না। এই দাবীর দৃঢ় বাস্তবভিত্তি আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ দেখিতে পাই না। আমার ত বিশ্বাস গণভোট সংগৃহীত হইলে বিহারী বঙ্গের বাঙালীগণই ইহার বিরোধিতা করিয়া বসিবে। মোটের উপরে তাহারা সুখেই আছে। মন্ত্রিত্ব না পাইবার দুঃখ সাধারণের দঃখ নয়, বিশিষ্টের দুঃখ, বিহারে মন্ত্রিত্ব পাইবার আশা নাই বুঝিয়াই কি বিহারী বঙ্গবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঙলায় ফিরিবার দাবী তুলিয়া থাকেন? কে বলিতে পারে! রমণী ও বাঙালীর মনের কথা 'দেবা ন জানন্তি'।

তবেই দেখা যাইতেছে, বাঙলাদেশ প্রকৃতপক্ষে চার খণ্ডে (নিখুঁত হিসাব করিতে গেলে সাড়ে তিন খণ্ডে) বিভক্ত—পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, পার্বত্যবঙ্গ এবং বিহারীবঙ্গ। পূর্ববঙ্গ আবার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

এ যেমন হইল বাঙলা দেশের ভৌগোলিক পরিণাম, সামাজিক পরিণাম তাহার চেয়েও বিচিত্র। যে কারণেই হোক বাঙালীসমাজের প্রতি বিহারী, ওড়িয়া, আসামী, পাহাড়ী এবং মুসলমানগণ (পূর্ববঙ্গের) ব্যাপকভাবে বিরূপ, এবং পূর্বোক্ত প্রদেশসমূহে বা অঞ্চলে বাঙালীর স্থান আজ সঙ্কটের ও সংশয়ের। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট মনে করিবার কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের চাপা-পড়া রেষারেষি আবার মাথা তুলিবার লক্ষণ দেখাইতেছে। ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গের লোককে কলিকাতার ব্যবসায়ে ও চাকুরিতে অনধিকারীর প্রবেশ মনে করিয়া পশ্চিমবঙ্গের একদল লোক উষ্মা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘোষ-মন্ত্রী-মণ্ডলের একাধিক মন্ত্রী (তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রী একজন) পূর্ববঙ্গের লোক—এই তথ্যও পশ্চিম-বঙ্গকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে আবার দুইটি ভাগ—পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতা-বঙ্গ। কলিকাতাশ্রয়ী লোক বলিতে বুঝি সেই-সব ব্যক্তি, কলিকাতার বাহিরে কোন জগতের অস্তিত্ব কার্যত যাহারা স্বীকার করে না। তাহাদের ধারণা, কলিকাতা নিরাপদ হইলে পৃথিবী নিরাপদ; তাহাদের ধারণা, পৃথিবী প্রলয়-প্লাবনে ভাসিয়া গেলেও কলিকাতার বটপত্র অবলম্বন করিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। কলিকাতাশ্রয়ী কোন কোন লোকের ইচ্ছা যে, সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদের সূত্র ধরিয়া মুসলমানগণকে কলিকাতা হইতে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলা উচিত। তাহাতে হিন্দু সমাজ, ভারতীয় জাতীয়তা দুই-ই বাঁচিবে, আবার যে-সব বস্তি-অঞ্চলে মুসলমানগণ নামমাত্র ভাড়ায় বাস করিতেছিল তাহা করায়ত্ত হইয়া নূতন ঐশ্বর্যের ভূমিকা রচনা করিবে। কলিকাতায় মুসলমান-উৎখাত-কার্য তাহারা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু পথের বাধা হইলেন গান্ধীজি। আর একটি বাধা—পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ। কলিকাতার প্রতিক্রিয়া পূর্ববঙ্গে দেখা দিতে পারে আশঙ্কা করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও তাহাদের কলিকাতাস্থ আত্মীয়স্বজনের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। এটা

কলিকাতাশ্রয়ীদের পছন্দ নয়। তাহারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ও কলিকাতবাসী পূর্ববঙ্গীয়গণকে ইতিমধ্যেই nuisance বলিয়া মনে করিতেছে। এই সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাটল বাঙলা দেশের দুই খণ্ডের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এবং ঘটনার চাপে আসামের অনুরূপ 'বঙাল খেদা' পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হইয়া গেলে, আর যিনিই বিস্মিত হোন, আমি হইব না।

এইসব ভেদও সহ্য করা যাইত, যদি দেখিতাম বুদ্ধিভ্রষ্ট বাঙালী-সমাজ ভারতীয়-সমাজের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে। কিন্তু সে লক্ষণই বা কই? বিশিষ্ট বাঙালীগণ রব তুলিয়াছেন যে, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ঘন ঘন দিল্লী যাইবেন কেন? দিল্লীর পরামর্শে দেশশাসন আর বৃটেনের পরামর্শে দেশশাসনে তাঁহারা প্রভেদ দেখিতে পান না। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ সহকারে যে প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসন করেন, আগামী নির্বাচনে তাঁহার বিরোধিতা করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। বিরোধিগণের অন্যতম হিন্দুমহাসভা। হিন্দুমহাসভার এই ভারত-বিরোধিতা বড়ই উপভোগ্য—যেন ভারতবর্ষে হিন্দু নাই, সমস্তই বাঙলা দেশে! দিল্লীর নিকটে অন্নের জন্য, অর্থের জন্য হাত পাতিতে পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা নাই, কেবল যত লজ্জা পরামর্শ গ্রহণ করিতে। বুদ্ধিতে বাঙালী কাহারো চেয়ে খাটো নয় কিনা! এ সব লক্ষণ—ওই মূল ব্যাধির লক্ষণ। সর্বনাশের বন্যা জাতীয় চরিত্রের সহস্র স্থানে বাঁধ ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কয়টা স্থানে মেরামত করিবে? আর সে ইচ্ছাই বা কাহার? কেন্দ্রীভূত হইয়া শক্তিবৃদ্ধি করিবার যুগ আসিয়াছে পৃথিবীতে—কিন্তু যাহারা মনে মনে অষ্টাদশ শতকের নৈরাজ্যের জগতে বাস করিতেছে, কেন্দ্রীকৃত স্বরাজ্যের সন্ধান তাহারা কি রাখে? চারিদিকের আঘাতে যখন আমরা দুর্বল, তখন কেন্দ্রীয় শাসনকে দৃঢ়তরভাবে আঁকড়াইয়া ধরিব—ইহাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কলি প্রবেশ করিয়াছে—বর্তমান অবস্থায় আমাদের যাহা প্রধান আশ্রয়, সেই কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আমাদের যত অভিযোগ। আমরা নিজেকে তাহার বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছি। বিপ্লবী বাঙালীর এই বিপ্লবটা সম্পন্ন হইলে তাহার আত্মনাশের ভরা কানায় কানায় পূর্ণ হয়।

বাঙলাদেশে ও বাঙালী সমাজে ভৌগোলিক ও সামাজিক যে-সব সূক্ষ্ম স্থূল ফাটল দেখা দিয়াছে তাহাদের উল্লেখ করিলাম—এবার ইহাদের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

৩

বাঙালীর এই অধঃপতনের প্রধান কারণ তাহার জীবনের ঐকান্তিক আত্মকেন্দ্রিকতা। একবার আত্মকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেলে জীবনের বৃত্ত ক্রমশ সঙ্কীর্ণতর হইতে হইতে নিজের পরিবারটিতে আসিয়া ঠেকে। অর্জুন লক্ষ্যভেদের সময়ে যেমন পাখীটির চক্ষুটি মাত্র দেখিয়াছিল, এই প্রক্রিয়ারও পরিণাম অনুরূপ দাঁড়ায়।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে আবির্ভূত হইবার পূর্বেকার বাঙালীর পল্লীসমাজ কৃষিনির্ভর ছিল। কৃষিনির্ভর সমাজ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক। তাহার জগৎ ক্ষুদ্র কৃষি-ক্ষেত্রের সীমার দ্বারা পরিমিত। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে পরস্পরে মিলিত হইবার যে উদার আসর, বাঙালী-সমাজের কখনো সেখানে ডাক পড়ে নাই। পূর্বতন বাঙালী আপনার কৃষিক্ষেত্র, চণ্ডীমণ্ডপ ও ক্ষুদ্র পল্লীসমাজে জীবন যাপন করিতেছিল। এমন সময়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসিয়া বৃহত্তর কর্মের ভূমিকা রচনা করিল। কিন্তু সেখানেও বাঙালী কর্মস্রোতে নামিল না, চাকুরি-জীবনের সঙ্কীর্ণ ও নিরাপদ পরিসরকে বাছিয়া লইল। চাকুরি-জীবিতার ফলে মানুষ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে—সেটাও অনেক পরিমাণে ওই কৃষিক্ষেত্রের নিরাপদ পরিমিতির অনুরূপ। শহরাশ্রয়ী যে নূতন বাঙালীসমাজ গড়িয়া উঠিল তাহার সহিত গ্রামাশ্রয়ী বাঙালীসমাজের গুণগত প্রভেদ রহিল না। দুই-ই আত্মকেন্দ্রিক। ব্যবসায়ে নামিলে মানুষকে

অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং এইভাবে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষে মানুষে বৃহত্তর মিলনের ভূমিকা রচিত হয়। কিন্তু চাকুরিজীবী ব্যক্তিকে বৃহত্তর সমাজের উপরে নির্ভর করিতে হয় না, কেবল মনিবের উপর নির্ভর করিলেই চলে। বৃহৎ বাঙালীসমাজের তুলনায় অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই চাকুরিতে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজের আদর্শ তো ওই চাকুরি-লাভ। চাকুরি-জীবিতাই শিক্ষিত বাঙালীসমাজের আদর্শ। এই আদর্শের ধ্যান করিতে করিতে আজ একশত বৎসরে আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহাও এই সঙ্কীর্ণতার পোষক হইয়াছে—যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল চাকুরি-লাভ। যতদিন পাশ করিতে পারিলেই চাকুরি-লাভ অব্যর্থ ছিল ততদিন বর্তমান শিক্ষার উপরে আমাদের আস্থা নষ্ট হয় নাই। কিন্তু যখন হইতে চাকুরি ও শিক্ষা মেল-বন্ধন পরিত্যাগ করিল—তখনই কেবল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরে আমাদের অনাস্থা দেখা দিতে লাগিল। এ শিক্ষা মনুষ্যত্বের পরিপোষক নয় বলিয়া আমরা আপত্তি করি নাই,—আমাদের আপত্তির মূলগত কারণ—এ শিক্ষায় চাকুরি জোটে না। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও কর্মপ্রচেষ্টা বাঙলাদেশেই যে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র তাহাই নয়, সর্ব প্রথমেও আরম্ভ হইয়াছিল। কাজেই ভারতীয় সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাঙালী-সমাজের উপরে তাহার বিষক্রিয়া ব্যাপকতমভাবে দীর্ঘতমকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আমরা অনেক সময়ে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া থাকি যে, বাঙালী-সমাজের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের সমাজের একটা মূলগত ভেদ আছে। এই উক্তির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠত্ববোধ আছে। বাঙালী-সমাজ ভারতের অন্যান্য-প্রদেশবাসীর চেয়ে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর কিনা সে আলোচনা নিষ্ফল। হয়তো কোন বিষয়ে হইলেও হইতে পারে। সাঁওতালেরা তীর-ধনুকের ব্যবহারেও তো শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কি প্রমাণ হয়? বাঙালীর সহিত অবাঙালীর যেখানে আসল প্রভেদ, সে ওই আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাপারে। অপর কোন প্রদেশ এমন একান্ত ভাবে

আত্মকেন্দ্রিক নয়, কতকটা বাহিরের কার্য-কারণের ফলে, কতকটা বা স্বভাবগত উপাদানের দরুন। কিন্তু মূল সত্যটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্ম-কেন্দ্রিকতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাতে আমরা যে ভারতের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া পড়িয়াছি কেবল তাহাই নয়, আমাদের সমাজের একখণ্ড অপরখণ্ড হইতে এক প্রকার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। আমাদের সমাজের এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইবার পথ রুদ্ধপ্রায় হওয়াতে কালক্রমে দুইয়ের চেহারা ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। একটা উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। একজন বিহারী কৃষক ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে অবশ্যই একটা দূরত্ব আছে, কিন্তু একজন বাঙালী কৃষক ও ডাঃ শ্যামা-প্রসাদের মধ্যে যে দূরত্ব, তাহা কেবল দুস্তর নয়, পূর্বোক্ত দূরত্বের তুলনায় অনেক বেশি। পূর্বোক্ত প্রভেদ নিতান্তই মাত্রাগত, শেষোক্ত প্রভেদ কি গুণগত হইয়া পড়ে নাই ?

আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ও সভ্যতার যুগ উনবিংশ শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে অবসিত হইয়াছে। বর্তমান কাল সমষ্টিগত সমাজের যুগ। আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীসমাজের শ্রেষ্ঠতার দিন ছিল উনবিংশ শতক। বিংশ শতকে তাহার জের টানিয়া চলিবার আশা বৃথা। এ কথাটা আমরা এখনো বুঝি নাই বা বুঝিবার চেষ্টাও করিতেছি না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, ইতিহাসের হাতুড়ি নির্বোধের মাথা বলিয়া খাতির করে না।

৪

বাঙলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্বের আলোচনায় দেখিয়াছি কতগুলি ফাটল ধরিয়াছে। বাঙালীর সামাজিক সত্তার আলোচনায় দেখিয়াছি—ফাটলের সংখ্যা সেখানেও অল্প নহে। যে-জাতির আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে এত অসংখ্য ছেদ—তাহার ধ্বংস অনিবার্য এবং অত্যাসন্ন। তবে ঠিক কোন্ পন্থায় এই

জাতিগত মৃত্যু আসিবে তাহা বলিতে পারি না। তবে যতদূর মনে হয়, পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের চাপ ও বিহার প্রদেশে ভারতীয়দের চাপ—বাঙালীর ধ্বংসের অব্যবহিত কারণরূপে দেখা দিবে। আর এই দুই চাপের মাঝে পড়িয়া পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু পরস্পরকে অভিযুক্ত, প্রত্যভিযুক্ত করিতে থাকিবে। কিন্তু সে অনিবার্য শোচনীয় পরিণাম পূর্বাহ্নে বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে ভীত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আমার নাই। আর প্রয়োজনই বা কি? অচিরকালের মধ্যেই স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য সকলের ঘটিবে।

রাষ্ট্রভাষা ও রাষ্ট্রলিপি

বঙ্গভাষাহিতৈষী মহলের কোন কোন প্রান্ত হইতে দাবী উঠিয়াছে যে, বাঙলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, যে হেতু বাঙলা সাহিত্য বর্তমান ভারতের সমৃদ্ধতম সাহিত্য, সেই কারণেই বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা-রূপে স্বীকৃত হইবার দাবী সর্বাগ্রগণ্য। আর আর যেসব যুক্তি তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন সেগুলি যুক্তি নয়, অজুহাত মাত্র। নিজেদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়মিত সভাসমিতি করিয়া বাঙলা ভাষার অনুকূলে তাঁহারা প্রস্তাব পাশ করেন—এবং সেই প্রস্তাব ও সভার সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যথাসাধ্য করেন—স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু আরও স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহাদের বক্তৃতামূলক চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালী-সমাজ এবিষয়ে এপর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। এই তো গেল বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইবার অনুকূলে অবস্থা। ওদিকে বাস্তব অবস্থাটা কি একবার দেখা যাক্।

হিন্দি ভাষা বা হিন্দি ভাষার একাধিক রূপ আইনত না হইলেও কার্য্যত ভারতবর্ষের সর্বজনীন ভাষা। অবশ্য ইংরাজি ভাষার প্রসঙ্গ এখানে তুলিতেছি না। হিন্দি এ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত না হইলেও তাহাই ভারতীয় ভাষার মধ্যে অধিকতম সর্বজনীন। ইংরাজি ভাষাকেও কেহ পৃথিবীর রাষ্ট্রভাষারূপে আইনত স্বীকার করে নাই—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইংরাজি ভাষাই কি পৃথিবীর সর্বজনীনতম ভাষা হইয়া ওঠে নাই? এই ইংরাজি ভাষার প্রসঙ্গ হইতেই বঙ্গভাষার প্রচারকগণ তাঁহাদের মূল যুক্তিটা পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, দেখো, ইংরাজি ভাষা আধুনিক জগতের সমৃদ্ধতম ভাষা, এ ভাষা শেক্সপীয়র

হইতে শ, মিলটন হইতে মেসফিল্ড এবং বেকন হইতে হার্ডির ভাষা, সেই কারণেই ইহা সহজে পৃথিবীর রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। তার পরে ঐ যুক্তিটাকে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরোপ করিয়া বলেন যে, বাঙলা সাহিত্য বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, এ সাহিত্য মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমৃদ্ধ—কেনই বা ইহা অন্তত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে না? ইংরাজি সাহিত্য বর্তমান পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ-স্থানীয় সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই কারণেই কি তাহা সর্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে? শেক্সপীয়র ও শ'র লেখনীস্পর্শে ভাষাটা যাদুদণ্ডের মতো শক্তিশালী হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার সর্বজনীন হইয়া উঠিবার কারণ অন্যত্র। ইংরেজ জাতি স্বভাবত ভূপর্যটক জাতি। ইংরেজের বাণিজ্য ও রাজ্য পৃথিবীব্যাপী। ইংরাজ বণিক, নাবিক ও রাজ্যপত্তনকারীর দল ইংরাজি ভাষাকে সর্বজনীনতম করিয়া তুলিয়াছে। শেক্সপীয়র বা শ'র সাধ্যও ছিল না—এই মর্যাদা ইংরাজি ভাষাকে দান করিতে পারেন। সাহিত্যের গৌরবে কোন ভাষা সর্বজনীনত্ব লাভ করে না—অন্য কারণে করে। সে কারণ আছে জাতির সর্বজনীন চরিত্রে, লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিভায় তাহা নাই। যে-জাতি ভবঘুরে তাহার ভাষাও ভবঘুরে। একটা জাতি নানা কারণে ভবঘুরে হয়, তন্মধ্যে বাণিজ্য, রাজ্যস্থাপন ও নাবিকবৃত্তি প্রধান। ইংরাজের জাতীয় চরিত্রে এই তিনেরই সম্মিলন ঘটিয়াছে। শেক্সপীয়র ও মিলটনগণ ইংরাজি ভাষাকে সর্বজনীন করিয়া তোলেন নাই, সর্বজনীন করিয়া তুলিয়াছেন কুক, ক্লাইভ, ড্রেক, রোডস্, আরবুথনট প্রভৃতি। ইংরাজের ইতিহাসে যাহাদের আমরা পাষণ্ড, পরপীড়নকারী ও সাম্রাজ্যবাদী বলি—ইংরাজি ভাষার সর্বজনীনত্বের কীর্তি তাহাদেরই প্রাপ্য। ইংরাজি সাহিত্যের গৌরবে ইংরাজের মহত্ত্বের পরিচয়, ইংরাজি সাহিত্যের সর্বজনীনত্বে তাহার জাতীয় চরিত্রের লোভ, পরস্বাপহরণবৃত্তি ও নীচতার পরিচয়।

সাহিত্যের গৌরবে ভাষার সর্বজনীন হইবার অধিকার যদি না থাকে তবে তো বঙ্গভাষা-প্রচারকদের প্রধান যুক্তিটারই তলা খসিয়া যায়। ভাষাভাষীর

জাতীয় চরিত্রের গুণে ভাষা সর্বজনীন হইয়া উঠে—ইহাই যদি সত্য হয়, তবে সেই গুণ ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে কোন্ ভাষাতে প্রচুরতম পরিমাণে আছে ? উত্তর ভারতের হিন্দি-ভাষী অঞ্চল বিহার হইতে দিল্লী এবং রাজপুতানা ও নাগপুর অবধি প্রসারিত। এই বৃহৎ ভূখণ্ডের ভাষায় ছায়াতপের ভেদ আছে, সূক্ষ্ম প্রভেদেরও অভাব নাই—কিন্তু সাধারণ ভাবে এই অংশের ভাষাকে হিন্দি বলা যাইতে পারে। এখানে যাহারা বাস করে—তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষণ কি ? তাহারা চরণশীল সমাজ। ব্যবসার জন্য, চাকুরির জন্য, অদৃষ্টের সঙ্গে পাঞ্জা করিয়া পুরস্কার আদায় করিয়া লইবার জন্য—তাহারা দলে দলে, সমাজের সমস্ত স্তরের লোক অগণ্য সংখ্যায় ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পড়িতেছে—এবং সেই সঙ্গে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা পোষণ না করা সত্ত্বেও নিজেদের ভাষাকে ভারতের সর্বজনীনতম করিয়া তুলিয়াছে। আইনের জোরে কোন ভাষাকে সর্বজনীন করা যায় না, অন্য কারণে পূর্ব হইতেই যাহা সর্বজনীন হইয়া আছে—আইন তাহাকে স্বীকার করিয়া লয় মাত্র। হিন্দি সর্বজনীনতম হইয়া আছে—বাঙলা নাই, শুধু নাই নয়, হইবার কিছুমাত্র আশাও নাই।

একটি উপমা লওয়া যাক্। গাছে আম পাকিলে বোঁটা হইতে খসিয়া গাছের তলে পড়ে—দূরে যায় না। আবার শিমুল ফল পাকিলে ফাটিয়া গিয়া ভিতরের বস্তু বায়ুভরে দূরে উড়িয়া যায়। ভাষা সম্বন্ধেও এই উপমা প্রযোজ্য। ইংরাজি ভাষা জঙ্গম জাতীয়—কারণ ইংরাজ জাতটাই জঙ্গম। আমাদের দেশে ঐ ধর্ম হিন্দি ভাষাতে আছে, কারণ হিন্দি ভাষাভাষিগণের প্রকৃতি জঙ্গম। ব্যবসা ও কর্মোপলক্ষ্যে তাহারা ভারতের কোথায় না গিয়াছে। আসামের জঙ্গলে ছোট একখানি আদিবাসী পল্লী—সেখানে একখানি মাত্র মুদির দোকান। সে মুদি বিহারী বা মারোয়াড়ী। সে চাল ডাল বেচিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুচারটা হিন্দি কথা ছড়াইতেছে—হিন্দি প্রচার চলিতেছে, যদিও সে নাগরী-প্রচারিণী সভার নামটাও জানে না। বাঙলা দেশে হিন্দিভাষী লোকের

সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। শত শত রেল-স্টেশনের হাজার হাজার কুলি হিন্দি-ভাষী। মফঃসল শহরগুলিতে নাপিত, ধোপা, দারোয়ান, দোকানদার প্রভৃতি অবাঙালী এবং হিন্দিভাষী—তাহারা অজ্ঞাতসারে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তারপরে কলিকাতা শহর। এখানকার ট্রাম, বাস, রিক্সা প্রভৃতির চালক হিন্দুস্থানী। ধোপা, নাপিত প্রভৃতি গার্হস্থ্য-বৃত্তিধারিগণ হিন্দুস্থানী। বহুতর সিনেমা ঘরে হিন্দি ছবি বাঙালী দর্শক দেখিতেছে—এবং রসোপভোগ করিতেছে। বস্তুত এখানকার ঘরের বাহিরের ভাষাই যেন হিন্দি-মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গভাষা-প্রচারকের দল যখন বাঙলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন তখন তাঁহাদের দেখা উচিত ঘরের ভাষা কি। আগে তাঁহারা কলিকাতার ভাষাকে বাঙলা ভাষায় পরিণত করুন, তার পরে অন্য কাজটায় হাত দিবার অবসর পাইবেন। মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, এক বাঙালী চাষীকে ছাড়িয়া দিলে বাঙলার জীবনের সমস্ত স্তরে, উচ্চ এবং নীচ, প্রচুর সংখ্যায় হিন্দুস্থানী আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ফলে হিন্দি প্রচারের পথ সুগম হইয়া গিয়াছে। হিন্দি-প্রচারকের দল এই সত্যটা জানেন—কাজেই তাঁহাদের দাবী বঙ্গভাষা-প্রচারকের দলের ন্যায় বাস্তববর্জিত নয়। আজ একশত বৎসর ধরিয়া হিন্দি প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে, কাজেই হিন্দি-প্রচারকদের দাবী বঙ্গভাষা-প্রচারকদের ন্যায় ভিত্তিশূন্য নয়। কার্যত হিন্দিকে সর্বজনীন ভাষা বলিয়া আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি—তর্কের বেলায় অস্বীকার করিলে চলিবে কেন?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাঙালী কি ভারতীয় সমাজে ছড়াইয়া পড়ে নাই? তবে তাহার ভাষাই বা সর্বজনীন না হইবে কেন? ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভকাল হইতে বাঙালী ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছে বটে—কিন্তু তাহার স্বরূপটা কি? যেসব বাঙালী ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাহারা প্রধানত

চাকুরি উপলক্ষ্যেই অন্য প্রদেশে গিয়াছে। সর্বশ্রেণীর হিন্দুস্থানীর ন্যায় সর্ব-শ্রেণীর বাঙালী অন্য প্রদেশে যায় নাই—সংখ্যার তুলনা আর নাই করিলাম। বাঙালী চাষী, বাঙালী কুলী, বাঙালী মুটে মজুর হাজারে হাজারে অন্য প্রদেশে গেলে তাহাদের মধ্যে যে বাঙলা ভাষা তথায় গিয়া লোকজীবনে প্রবেশ করিতে পারিত, বাঙলা ভাষা সর্বজনীন হইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইত। বস্তুত এই প্রদেশ হইতে গিয়াছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আর তাহারা প্রবাস-প্রদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কতক পরিমাণে প্রভাবিত করিতেও পারিয়াছে সত্য। অন্য প্রদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বাঙলা ভাষার জ্ঞান এবং বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ অবহেলা করিবার মতো নয়। এই জ্ঞান ও আগ্রহ আরও বাড়িত, কিন্তু বাঙালীর স্বভাব এই যে, প্রবাসে গিয়া সে প্রবাসী বাঙালী সাজিয়া থাকে, অবাধে, অসঙ্কোচে মিশিতে পারে না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—তখনকার ইংরাজের অনুগৃহীত বাঙালী প্রবাসের সমাজে মিশিতে লজ্জাবোধ করিত, যেমন এবং যে কারণে ইংরাজেরা আমাদের সমাজে মেশে না। প্রবাসী বাঙালীগণ নিজেদের ক্লাবে এবং কালীবাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিয়া আভিজাত্য বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করিত—ফলে অনেক স্থলে একাধিক পুরুষ বাস করিবার পরেও, কারত সেই প্রদেশে স্থায়ী হইবার পরেও, তাহার প্রবাস-দশা আর ঘুচিল না। প্রবাসী বাঙালী প্রবাস-প্রদেশকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিলে বাঙলা দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের সেতুস্বরূপ হইতে পারিত, কিন্তু ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইবার ফলে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষের প্রাকার-রূপে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা বিচার করিলে, অর্থাৎ প্রবাসে যত বাঙালী গিয়াছে আর বাঙলা দেশে যত অবাঙালী প্রবেশ করিয়াছে এ দুইয়ের তুলনা করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে কেন বাঙলা ভাষার বৃহৎ পটভূমি রচিত হয় নাই আর কেনই বা হিন্দির সুবৃহৎ পটভূমি রচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রভাষা কেবল শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা নয়, জনসাধারণের ভাষা। বাঙালীর মনীষা ভারতবর্ষের শিক্ষিত

চিত্তকে প্রভাবিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আজ হঠাৎ বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী তুলিলে চলিবে কেন? সে সাধনা কোথায়? সাহিত্যের গৌরবে কোন ভাষা সর্বজনীন হয় না—হয় জীবনের গৌরবে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রসারে। বাঙালীর কীর্তির তালিকায় পরবর্তী দাবীটি নাই। অতএব বঙ্গভাষা-প্রচারকদের মাতৃভাষাপ্রীতিকে যতই প্রশংসা করি না কেন—তাঁহাদের শ্রম পণ্ডশ্রম হইতে বাধ্য—কারণ তাঁহারা ইতিহাসের গতির উজানে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী স্বীকার না করিতে পারিলেও, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহার উপায় কি? অবশ্য রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইলে একটা সমাধান পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহার সম্ভাবনামাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। এরকম ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষা প্রসারের বিকল্প উপায় কিছু আছে কি না চিন্তা করিতে হইবে। অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বাঙলা লিপির পরিবর্তে দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করিলে বাঙলা সাহিত্য প্রসারের একটা উপায় হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে বর্তমান অবস্থায় বাঙলা সাহিত্যের প্রভাবকে ভারতীয় জীবনে প্রসারিত করিয়া দিবার ইহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু এই প্রস্তাবটিকে বাঙালী সহজে গ্রহণ করিবে বালয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যেই কোন কোন প্রভাশালী মহল হইতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা হইয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে যুক্তির অপেক্ষা সংস্কার প্রবলতর। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বাঙলা লিপি পরিত্যাগ করিয়া দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করিলে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইবে। ইহা স্পষ্টত যুক্তি নয়, সংস্কার। সংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি অচল প্রায়। কিন্তু সংস্কারের বিরুদ্ধে অপর এক সংস্কারকে খাড়া করিয়া দিলেই বা এমন কি উপকার হইবে? কাজেই যুক্তিকেই ব্যবহার করিতে হইবে—তাহার প্রভাব যতই অল্প হোক না কেন।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যে তাহার অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহা এতদিন

জানিতাম না। কিন্তু সে অক্ষর কোন্ অক্ষর? বাঙলার প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অক্ষর ও বর্তমান ছাপার অক্ষর এক নয়, আবার হাতের অক্ষর ও ছাপার অক্ষরেও প্রভেদ আছে। তার উপরে বাঙলা সাধারণ ছাপার ও লাইনো টাইপে ছাপার ছাঁদও স্বতন্ত্র। এ-রকম ক্ষেত্রে ঠিক কোন্ ছাঁদকে অবলম্বন করিয়া ঠিক কতখানি বৈশিষ্ট্য বিরাজমান তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে অনুমান করা সহজ নয়। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় যে, বাঙলা অক্ষরের বিভিন্ন ছাঁদে যতই প্রভেদ থাক্—মূলত সবই এক। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বিচার করিতে নামিয়া মূল পর্যন্ত যাইতে হইল; যদি তাহাই হয়, তবে আরও একটু নিচে যাওয়া যাক্ না কেন—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে দেবনাগরী অক্ষর ও বাঙলা অক্ষর মূলত এক—অর্থাৎ একই মূল লিপির বিকার—দুইটি লিপিই সহোদরস্থানীয়। সাধারণত হিন্দি ভাষা দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা যে, দেবনাগরী লিপি হিন্দি ভাষার স্বকীয় বস্তু। বাস্তবিক তাহা নয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মতো দেবনাগরী লিপি ভারতের সাধারণ সম্পত্তি, কোন প্রদেশ বা ভাষা বিশেষের তাহা একান্ত নিজস্ব নয়। অনেক বাঙালী হিন্দির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিতে রাজি আছেন—তবে সংস্কৃতের বাহন দেবনাগরী লিপিকে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ কেন? মনে রাখিতে হইবে যে, ভাষা লিপি নয়; লিপি ভাষার বাহন মাত্র—যুগের দাবীতে মানুষ যুগে যুগে বাহন পরিবর্তন করিয়া আসিতেছে। বাঙলার নিজস্ব গোরুর গাড়িকে ত্যাগ করিয়া মোটর গাড়িকে স্বীকার করিবার সময়ে বাঙলার বৈশিষ্ট্য গেল গেল—এইরূপ রব তো শোনা যায় নাই। অথবা অধিক বিস্তারে কি লাভ? সংস্কারের বর্ম ভেদ করিবার শক্তি যুক্তির নাই।

সন্দেহ করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে, এই সংস্কারের মূলে আছে বাঙালীর প্রাদেশিক বুদ্ধি। বাঙালীর পরমায়ুর গৌরবের দিনে সে সর্বপ্রকারে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার উপরে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আর আজ তাহার

গৌরবের পরমায়ুর অবসানে সব দিক দিয়াই আত্মসঙ্কোচন ও ভারতবিমুখতার প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—বাঙালীর জীবনে। জস্টিস সারদাচরণ মিত্র যখন 'এক লিপি বিস্তার' সমিতি স্থাপন করিয়া দেবনাগরী লিপিকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তখনও বাঙালীর গৌরব-জীবনের একান্ত অবসান ঘটে নাই। একজন মনীষী বাঙালী যে দিগদর্শন দিয়াছিলেন—আজ সেই পথটাকেই আমাদের ভ্রান্ত মনে হইতেছে। আজ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে বেড়া তুলিবার প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে, তার মধ্যে বাঙালীর বেড়া সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে মজবুত, এবং সবচেয়ে কাঁটাওয়ালা। সমস্ত ভারত একটিমাত্র লিপি গ্রহণ করিলে এই প্রাদেশিক বেড়া ভাঙিবার কাজে সাহায্য করা হইবে। বিরোধী পক্ষ বলিবেন—লিপি মাত্রের সাম্যে কতটুকুই বা বাধা দূর হইবে? আমার বক্তব্য—যতটুকু হয় সেইটুকুই লাভ। অবস্থা যে-রকম দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আশা করিতেই যে ভরসা হয় না।

প্রাদেশিক বুদ্ধির প্রতিষেধক হিসাবে দেবনাগরী অক্ষর কিছু সুফল প্রসব করিতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আরও যুক্তি আছে। ইংরাজি বর্ণমালাকে বাদ দিলে দেবনাগরী লিপি ভারতের সর্ব-প্রদেশের একমাত্র পরিচিত লিপি। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই দেবনাগরী লিপির সহিত অল্পাধিক পরিচয় আছে। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেও, সংস্কৃত ভাষার প্রসার আছে বলিয়া, দেবনাগরী লিপি পরিচিত। ফলত দেখা যাইতেছে দেবনাগরীকে ভারতের রাষ্ট্রলিপিরূপে গ্রহণ করিবার একটা ক্ষেত্র আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। সেই সাধারণতম লিপিকে বাঙলা লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

একমাত্র আপত্তি—সংস্কার। এই সংস্কারকে বর্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে সুবিধা প্রচুর। বাঙলা সাহিত্য দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ও রূপান্তরিত হইলে একদিনে তাহা ভারতের শিক্ষিত সমাজের পাঠযোগ্যত্ব লাভ করিবে। তৎসম-শব্দ-বহুল বাঙলা সাহিত্য বুঝিয়া ওঠা শিক্ষিত অবাঙালীর পক্ষে আদৌ কঠিন নয়—বর্তমানে তাহার প্রধান অন্তরায় বাঙলা লিপি।

একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। বাঙালী-রচিত যে-দুটি সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হইবার দাবী অর্জন করিয়াছে—সেই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত ও 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীতের কোনটাই পুরাপুরি বাঙলা নয়। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত আনন্দমঠ উপন্যাসে পঁয়তাল্লিশটি ছত্র বিন্যাসে সজ্জিত, তার মধ্যে মাত্র ছয়টি পুরাপুরি বাঙলা। আর 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীতটির ভারতব্যাপী আদরের কারণ এই যে, সঙ্গীতটি সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে লিখিত—আর সেইজন্যই তাহা অবাঙালীর পক্ষে দুরুচ্চার্য নয়। এই সঙ্গীতটিতে মাত্র ষোলটি তদ্ভব বা সংস্কৃতজ শব্দ আছে—দেশী বা খাঁটি বাঙলা শব্দ একটিও নাই—বাকি শব্দগুলি সবই অবিকৃত সংস্কৃত। এ রকম ক্ষেত্রে এই দুইটি কবিতা বা এই জাতীয় সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙলা রচনা বুঝিবার প্রধান অন্তরায় বাঙলা অক্ষর। বাঙলা অক্ষরের পরিবর্তে দেবনাগরী লিপি ব্যবহৃত হইলে বাঙলা সাহিত্যের অনেকাংশ অবাঙালী শিক্ষিতের উপভোগ্য হইয়া উঠিবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি। এবং এইরূপে বাঙলা সাহিত্যের সহিত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের পরিচয়ের পথ সুগম হইয়া আগ্রহ বৃদ্ধি পাইলে বাঙলা সাহিত্যের যে অংশে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষাকৃত অল্প, ক্রমে তাহারও সহিত পরিচয় হইবে আশা করা যাইতে পারে। বাঙলা লিপি সর্বদেশের পরিচিত লিপি হইলে তাহাকেই সর্বভারতীয় লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতাম—কিন্তু সে যুক্তি দেবনাগরীর পক্ষে থাকায় তাহাকেই গ্রহণ করা উচিত।

অপর পক্ষে দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করিলে বাঙালীরও লাভ অল্প নয় লিপির বাধা দূর হইবার ফলে ভারতীয় জীবনে ও সাহিত্যে বাঙালীর প্রবেশ অনেক পরিমাণে অবাধ হইবে। বাঙলা পুস্তক-ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বাড়িবে আর সবচেয়ে মহৎ লাভ এই যে, বাঙলার মনীষা দেবনাগরী বাহনকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় জীবনকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইবে—এখনকার মতো ইংরাজি অনুবাদের বা ভারতীয় অন্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে খণ্ডিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে না এবং এই উপায়ে আইনত রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত

না হইয়াও বাঙলা ভাষা ভারতরাষ্ট্রের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে নূতন এক মর্যাদা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। আবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া আসা যাক্। দেবনাগরী গ্রহণের বিপক্ষে সংস্কার প্রবল আর স্বপক্ষে এতগুলি যুক্তি। এখন বাঙালী-সমাজ কোন্ পক্ষ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া বলিব? বাঙালীর মনস্তত্ত্ব দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রদেশ একাগ্রভাবে প্রাদেশিক হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রক্রিয়ার পরিণাম স্মরণ করিতেও ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই ভীত হইবেন। ধর্মগত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির পরিণাম কি দেখিয়াছি। এবার আপনাদের সম্মুখে আসিতেছে প্রদেশগত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বিভীষিকা। ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার ফলে ভারতবর্ষ তিন খণ্ড হইয়াছে, প্রদেশগত সাম্প্রদায়িকতার পরিণামে ভারতরাষ্ট্র দশ বিশ খণ্ড না হইয়া গেলেই বিস্মিত হইব। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি ও চেষ্টা প্রদেশগত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে ঘৃতাহুতি দিতেছে। বৃটিশ-পূর্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনো ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হয় নাই—তৎসত্ত্বেও ভারতের সংহতি বারংবার ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আর এখন যদি সর্বপ্রকারে প্রাদেশিক সত্তাকে জীয়াইয়া রাখা হয়, জীয়াইয়া তোলা হয়, তবে অচিরকাল মধ্যে ভারতরাষ্ট্র কতকগুলি বিবদমান এবং কালক্রমে পরস্পরের সহিত যুধ্যমান প্রদেশসমষ্টিতে পরিণত হইবে। প্রদেশের জনতার মধ্যে ভারতরাষ্ট্র লোপ পাইবে—ইতিমধ্যেই ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের টানাটানিতে ভারতবর্ষ লোপ পাইয়াছে।

অবিলম্বে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই এই আশঙ্কার বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠিয়া ইহার প্রতিকারে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যে যে উপায়ে ভারত-রাষ্ট্রের সংহতি বৃদ্ধি পায় তাহা বরণীয়, যে যে পন্থায় ভারতরাষ্ট্রের সংহতি নষ্ট হয় তাহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। যদি হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিলে

ভারতের সংহতি বৃদ্ধি পায়, তবে হিন্দিকে স্বীকার করিতে হইবে। যদি এক লিপির বিস্তার সাধন করিলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে তাহাই করিতে হইবে। যদি প্রাদেশিক সরকারের হাত হইতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা সরাইয়া লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দিলে ভারত-সংহতি ঘনিষ্ঠতর হয়, তবে একান্ত অপ্রিয় হইলেও তাহাই কর্তব্য। আবার যদি দেখি, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করিলে দেশের সংহতি নষ্ট হইবার আশঙ্কা; তবে সে পথ পরিহার করা আবশ্যক। মানভূম বা অন্ধ্র বিহারে থাকিল কি মাদ্রাজে থাকিল তাহাতে কি আসে যায়? যতক্ষণ সে সব স্থান ভারতরাষ্ট্রে আছে, সকলেরই আছে—সকলের কল্যাণ ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আছে। আরও অনেক দূর যাইতে রাজি আছি। ভারতের সংহতি রক্ষা ও বৃদ্ধিকল্পে কোন প্রদেশের অবলুপ্তি আবশ্যক হইলে তাহা করিতে হইবে, কোন প্রাদেশিক ভাষার বর্জন আবশ্যক হইলে তাহাও করিতে হইবে। প্রাদেশিক পরশ্রীকাতরতার ফলে সমগ্রের সংহতি নষ্ট হইয়া ভারতবর্ষ বহুবার বিদেশীর পদানত হইয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের মূল ব্যাধি। সে ব্যাধিকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলিতে পারে না। ইতিমধ্যেই দেশের রাজনীতিতে সেই মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রময় এক ভাষা ও এক লিপি এই ব্যাধির দুইটি ঔষধ—সেইজন্যই এই দুইটি বিষয় বরণীয়। কিন্তু আসল ঔষধ সংহতি রক্ষার ও সংহতি বৃদ্ধির সঙ্কল্প।

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির পক্ষ হইতে গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকটে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই স্মারকলিপিতে বাঙলার ও বাঙলার বাহিরের দুইশতাধিক প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, মহারাজা, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ্, অধ্যক্ষ, শিল্পী, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, সরকারী উচ্চ কর্মচারী, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি" স্বাক্ষর করিয়াছেন। মোটামুটি এই স্মারকলিপির দাবি দুই প্রকার। প্রথম দাবী এই যে, একটিমাত্র ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা না করিয়া আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুসারে বাঙলা, হিন্দি ও দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করা হোক। দ্বিতীয় দাবী এই যে, যদি একটি মাত্র ভাষাকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করা স্থির হয়, তবে সেই পদবী বাঙলা ভাষাকে দেওয়া হোক। এই বলিয়া বাঙলার রাষ্ট্রভাষা হইবার অনুকূলে যে-সব যুক্তি আছে বলিয়া সমিতি মনে করেন, সেই সব গুণ ও যুক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

স্মারকলিপিখানি একটি আশ্চর্য দলিল, যতই পড়া যায় ততই বিস্ময়ের মাত্রা চড়িতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত ইহার রচনাকারীকে তাঁহার অনভিপ্রেত কারণে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতে হয়।

বিস্ময়ের প্রথম কারণ, স্মারকলিপির অদ্ভুত যুক্তিজাল; দ্বিতীয় কারণ, স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা ও দায়িত্ববোধ; তৃতীয় কারণ, সমিতির সভাপতির প্রকাশ্য ভিন্নমত পোষণ; চতুর্থ কারণ, স্মারকলিপির বক্তব্য ও ভাষার আচরণের অনৈক্য। শেষের দিক হইতেই আগে আরম্ভ করা যাক্।

স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোক বাঙলা ভাষা

বুঝিতে পারে। কিন্তু এই দাবীতে সমিতি বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, তেমন হইলে স্মারকলিপি বাঙলা ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু বস্তুত স্মারকলিপিখানি ইংরেজিতে লিখিত। যে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বাঙলা জানে বলিয়া সমিতির দাবী, সে দেশের গণপরিষদের সদস্যগণের উদ্দেশে ইংরেজলিপি পেশ করা হইল—এ বড় রহস্য। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, "বাঙালী-বিদ্বেষী" অন্যান্য প্রদেশ বাছিয়া বাছিয়া বাঙলা-না-জানা লোকদেরই নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছে। এমন একটি গুপ্ত কারণ না স্বীকার করিয়া লইলে স্মারকলিপির ভাষাকে সমর্থন করা যায় না। তৃতীয় বিস্ময়ের কারণ এই যে, সমিতির সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সমিতির মতের মূলগত অনৈক্য। যেদিনের সংবাদপত্রে এই স্মারকলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, সেইদিনকার কাগজেই ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতার মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিতেছেন,—ইংরেজি অবিলম্বে বর্জন করা হয়তো সম্ভবপর নয়, কিন্তু ভারতের জন্য একটি ভাষা স্থির করিতে তাঁহাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রত্যেক ভারতবাসীর হিন্দিতে কথা বলা অভ্যাস করা উচিত, তাহা হইলেই ইংরেজির বদলে একটি ভারতীয় ভাষা প্রচলন করা সম্ভবপর হইবে। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিভিন্ন ভাষার সঙ্কটকে তিনি সামাজিক সংহতির অভাব বলিয়া মনে করেন। এবং উহার নিন্দা করেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের রিপোর্ট যদি যথাযথ হইয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, সমিতির স্মারকলিপির ঠিক বিপরীত তাঁহার মত। যদিচ ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্পষ্টত হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত এমন কথা বলেন নাই। কিন্তু যাহা বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিতার্থ কি তাহাই নয়? অন্তত রিপোর্ট হইতে কিছুতেই বলা চলে না যে, বাঙলা ভাষাকে ভারতের একমাত্র বা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার ইচ্ছার আভাসমাত্রও তাঁহার মনে আছে। তাঁহার বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারি যে, (১) একটিমাত্র ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা

হইবে, (২) প্রত্যেক ভারতবাসীর হিন্দিতে কথা বলা অভ্যাস করা উচিত, (৩) তবেই ইংরেজির বদলে একটি ভারতীয় ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হইবে। এখন এই তিনটি অংশকে যোগ করিলে দাঁড়ায় না কি যে, ইংরেজির বদলে হিন্দি ভাষাই প্রত্যেক ভারতবাসীর সাধারণ ভাষা হওয়া উচিত? পক্ষান্তরে ইহাই কি রাষ্ট্রভাষার সংজ্ঞা নয়? সমিতির স্মারকলিপির সহিত সমিতির সভাপতির স্পষ্ট মতবিরোধ সত্যই বিস্ময়কর *

স্মারকলিপির দ্বিতীয় যুক্তি 'দুইশত প্রতিষ্ঠাবান' ব্যক্তির স্বাক্ষরের গুরুত্ব। ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, নানা কারণে লোকে এই কাজ করিয়া থাকে। কেহ চক্ষুলজ্জার জন্য, কেহ নীরস আলোচনাকে যত সত্বর সম্ভব ছাঁটিয়া সমাপ্ত করিবার জন্য, আবার কেহ বা একখানা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া কথিত দলিলে স্বাক্ষর করিবার গৌরব অনুভব করিবার জন্যই নাম সই করিয়া থাকেন। ফলকথা, অনেক লোকেই পরিণামকে নিরাপদ বলিয়া বুঝিতে পারিলে অপর দায়িত্বের কথা স্মরণ না করিয়াই সই করিয়া থাকেন। স্বাক্ষরের সহিত কোনরূপ দায়িত্ব জড়িত আছে জানিতে পারিলে দুইশতের মধ্যে কয়টি স্বাক্ষর জুটিত তাহাই ভাবিতেছি। অধিকাংশ বনিয়াদি জমিদার যেমন পরিণাম স্মরণ না করিয়াই তমঃসুকে সহি করেন, সাধারণত স্মারকলিপির স্বাক্ষরেরও প্রায় সেই অবস্থা। স্বাক্ষরমাত্রের দ্বারা দেশসেবা করিবার লোভ সংবরণ করা সহজ নয়, বিশেষ সে স্বাক্ষর যখন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তৎসত্ত্বেও ধরিয়া লইতে হইবে যে, অনেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি দায়িত্ব বুঝিয়াই স্বাক্ষর করিয়াছেন। এ রকম ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা থাকে—এক, তাঁহারা সত্য সত্যই বাঙলা ভাষার কথিত দাবীতে বিশ্বাস করেন; দুই, সমিতির সভাপতির ও সমিতির মধ্যে যেমন একটা ভুল বোঝার ছায়া নামিয়াছে তেমনি হয়তো একটা বুঝিবার ভুল তাঁহাদের মনে আছে।

* বর্তমান ক্ষেত্রে সভাপতির মতকেই উদার ও যুক্তিসহ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের যুক্তি সত্য হইলে দুইশত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির স্বাক্ষরের অনেকগুলিই বাদ পড়িবার কথা। তৎসত্ত্বেও কতক লোকে বাঙলা ভাষার দাবীতে বিশ্বাসবান, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

এবারে বিস্ময়ের প্রথম কারণ বা সর্বশ্রেষ্ঠ কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা আর কিছুই নয়, স্মারকলিপির যুক্তিজাল, যে জালের টানে ডোবা জাহাজ তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। যুক্তিগুলি যেমন বিচিত্র তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। মনে রাখিতে হইবে, এইসব যুক্তির উপরেই সমিতির দাবী প্রতিষ্ঠিত। সমিতির প্রথম দাবী, বাঙলা ভাষাকে ভারতের তিনটি রাষ্ট্রভাষার অন্যতম গণ্য করা হোক; দ্বিতীয় দাবী, যদি একটিমাত্র ভাষাই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে বাঙলা ভাষাকে সেই অধিকার দেওয়া হোক।

প্রথম দাবীর অনুকূলে সমিতির যুক্তি এই যে, এদেশে একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কোন কারণ নাই; যেহেতু এদেশ একটি অখণ্ড দেশ নয় এবং একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি বলিয়াও কিছু নাই। সমিতি বলিতেছেন —অতএব একটিমাত্র ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবারও কারণ থাকিতে পারে না। সমিতির যুক্তি এই—"গত ৬০ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কংগ্রেস ভারতে এক মহাজাতি গঠনের পরিকল্পনায় সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। জনাব মহম্মদ আলি জিন্নার মতবাদ অনুসারে ভারত আজ দ্বিখণ্ডিত।" সমিতির যুক্তি যদি বুঝিয়া থাকি, তবে তাহার সরল অর্থ এই যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আদার্শের মধ্যে লীগের আদর্শই সত্য। কংগ্রেস পণ্ডশ্রম করিয়াছে, লীগের শ্রম সার্থক। অতএব ভ্রান্ত আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া জনাব জিন্নার মতবাদ স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। আর তাহা স্বীকার করিয়া লইলে বহুজাতিক এই দেশে একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করা অবশ্য-কর্তব্য হইয়া পড়ে।

প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে ছাপার অক্ষরে এমন যুক্তি উপস্থাপিত করিতে পারে, তাহা সত্যই আমার অজ্ঞাত ছিল। আবার 'দুইশত প্রতিষ্ঠাবান'

ব্যক্তি যে এমন যুক্তির নিচে নিজেদের স্বাক্ষর অঙ্কিত করিতে পারেন, তাহা এখনও বিশ্বাস হইতেছে না। কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের প্রতি এমন সর্বাঙ্গীণ অনাস্থা আর কোথাও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ! আর বড় কৌতুক এই যে, কংগ্রেসকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করিয়াও এই স্মারকলিপি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠিত গণপরিষদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। এক একবার সন্দেহ হইতেছে, সমিতির কি ইহাই যথার্থ মত, না কংগ্রেস-বিরোধীদের প্রতি নিক্ষিপ্ত ইহা একটি নিদারুণ ব্যঙ্গবাণ? আর যদি সত্যই ইহা সমিতির অভিমত ও বিশ্বাস হয়, তবে বলিব এই স্মারকলিপি ভুল ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছে। ইহা ভারতরাষ্ট্রের গণপরিষদে প্রেরিত না হইয়া পাকিস্থানের গণপরিষদে প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ মুসলিম লীগের ও মিঃ জিন্নার আদর্শের এত বড় সমর্থন ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সত্যই মিঃ জিন্না সৌভাগ্যবান! তথাকথিত বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হইতে এমন সমর্থন পাওয়া অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

এই স্মারকলিপির যুক্তি পড়িয়া গণপরিষদের সদস্যগণ যদি বাঙালীর বুদ্ধি-বৃত্তি সম্বন্ধে প্রতিকূল মত গঠন করেন, তবে সে দোষ কাহার? কংগ্রেসানুরাগী ভিন্ন প্রদেশবাসী কেহ যদি প্রতিবাদ করেন, তবে কি তাঁহাকে "বাঙালী-বিদ্বেষী" বলিয়া মনে করিতে হইবে? স্মারকলিপিতে Stop gap হিসাবে অনেকবার রবীন্দ্রনাথের নাম করা হইয়াছে। এই যুক্তি এবং যুক্তির তলে নিহিত মনোভাব কি রবীন্দ্রনাথের প্রদেশবাসীর যোগ্য? এই যুক্তির আঘাতে ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের চক্ষে বাঙালীকে কি ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দেওয়া হইল না? ভারতরাষ্ট্রের মুসলমানগণের নিকট হইতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য আদায়ের দাবী অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু স্মারকলিপির এই যুক্তির ফলে ভারতরাষ্ট্রের বিঘোষিত আদর্শের প্রতি কি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয় নাই? আর সে যুক্তি আসিল কিনা বাঙালীর মুখ হইতে! সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক বা অন্য কোনরূপ মর্যাদা ও গরিমা আমার নাই—কিন্তু

আমি যে বাঙালী-সমাজের একজন তাহা তো নিশ্চিত। এই স্মারকলিপির যুক্তি স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। বাঙালীর বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রদেশ ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া আমাদের অভিযোগ। কিন্তু এই স্মারকলিপির চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র আর কি হইতে পারে, এবং ইহা আমাদের স্বকৃত।

দুইশত প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির স্বাক্ষরের সঙীন তুলিয়া স্মারকলিপি সগৌরবে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, মিঃ জিন্নার দ্বৈজাত্যবাদই সত্য, আর কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের আদর্শ ভ্রান্ত। উত্তম! কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শের স্বপক্ষেও কিছু কিছু স্বাক্ষরের সম্বল আছে। গান্ধীজীর উল্লেখ করিব না, কারণ তিনি অবাঙালী, বিশেষ কংগ্রেসের আদর্শকে ভ্রান্ত বলায় বস্তুত তাঁহাকেই ভ্রান্ত বলা হইয়াছে। তবে সমিতির কাছে বাঙালীর স্বাক্ষরের কিছু গুরুত্ব থাকিলেও থাকিতে পারে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সমস্ত মনীষী বাঙালী কংগ্রেসের আদর্শের সূত্রেই চিন্তা করিয়াছেন অথবা তাঁহাদের আদর্শের সূত্রেই পরবর্তীকালে কংগ্রেস গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। সমিতিকে তো রবীন্দ্রভক্ত বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শটা কি? কবিগুরুর ভারততীর্থ কবিতাটা নিশ্চয় বেতারযোগে বা ছাত্রদের আবৃত্তি-সূত্রে তাঁহাদের কানে ঢুকিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য রচনার কথা না হয় নাই তুলিলাম, কারণ বাঙলা ভাষার প্রসার-চেষ্টায় যাঁহারা সমর্পিতপ্রাণ, সেই বাঙালী সাহিত্যিকের রচনা পাঠ করিবার সময় তাঁহাদের কোথায়? রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ অবধি কোন বাঙালী মনীষী মিঃ জিন্নার উদ্ভাবিত এবং সমিতি-কর্তৃক সমর্থিত দ্বিজাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহারা ভারতের অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, বস্তুত এ যুগে ভারতের অখণ্ডত্বের তাঁহারাই আবিষ্কারক। মনে রাখিতে হইবে, বস্তু খণ্ডিত হইলেও আদর্শ খণ্ডিত হয় না এবং যতক্ষণ আদর্শ অখণ্ডিত আছে, বস্তুরও খণ্ডত্ব ঘুচিবার সম্ভাবনা থাকে। মিঃ জিন্না এবং সমিতি সেই সম্ভাবনাটাই দূর করিতে চান।

সমিতির ঘোষিত নীতিই যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা বাঙালী মনীষীদের

এবং বাঙালী মনীষার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান, ঘন ঘন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির নামোচ্চারণ পরিত্যাগ করুন, আমরা বুঝিয়া লই তাঁহারা কোথায় আর আমরা কোথায়। বুঝিয়া লই যে, ভারতের অখণ্ডতার পরিবর্তে বাঙলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টায় তাঁহাদের কোনরূপ দ্বিধা নাই; বুঝিয়া লই যে, মিঃ জিন্নার দ্বৈজাত্যবাদের ফাটল দিয়া বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে smuggle করিয়া ঢুকাইয়া দিতে সমিতি সচেষ্ট; বুঝিয়া লই যে, মিঃ জিন্নার মতকে সমর্থন করিবার ভয় দেখাইয়া ইহা Blackmail-এর একটা চেষ্টা। বাঙলা ভাষার প্রতি দরদ সমিতির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কম ছিল মনে করিবার কারণ নাই, কিন্তু মূল কাটিয়া শাখায় জল ঢালিবার কল্পনাও তিনি করেন নাই। প্রতিষ্ঠাবান স্বাক্ষরকারী মহারাজা, উচ্চ সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষের ন্যায় বাঙলা ভাষার প্রতি দরদ আমার থাকিবে, তাহা আমি নিজেও আশা করিতে পারি না, তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিব যে, দল বাছিবার প্রয়োজন হইলে দুইশত প্রতিষ্ঠাবান স্বাক্ষরকারীদের পংক্তি ত্যাগ করিয়া রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অমর পংক্তির আশ্রয়-ছায়ায় গিয়া সবিনয়ে দাঁড়াইব। সমিতির অনাস্থাজ্ঞাপক দুয়ো ধ্বনিতেও বিচলিত হইব এমন সম্ভাবনা মাত্র দেখি না।

বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার অধিকারের প্রসঙ্গে সমিতির স্মারকলিপি বলিতেছে—"কোন একটি ভাষাকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে অন্য কোন প্রদেশ বা জাতির উপরে, বিশেষত যাহাদের ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ উন্নত, তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া অত্যাচারের নামান্তর মাত্র, এবং ইহা একপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ।" তার পরেই বলা হইয়াছে—"যদি একান্ত ভাবে একটি মাত্র ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও বাংলার দাবীই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।"

এই দুইটি অংশ মিলাইয়া পড়িয়া অনিচ্ছাকৃত Ironyর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাইলাম। হিন্দি ভাষাকে জোর করিয়া বাঙলার উপরে চাপাইয়া

দেওয়া অত্যাচার এবং এক প্রকার সাম্রাজ্যবাদ—কিন্তু বাঙলা ভাষাকে জোর করিয়া হিন্দি তথা সমস্ত ভারতীয় ভাষার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া অত্যাচার বা কোন প্রকার সাম্রাজ্যবাদ নহে। সমিতি হয়তো বলিবেন—নহেই তো—কারণ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ উন্নত। কিন্তু সাহিত্যিক গুণ আর রাষ্ট্রভাষা হইবার গুণ—এক নহে, সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সমিতি বলিতেছেন—"অধিকাংশ লোকের কাছে বোধগম্য, কেবলমাত্র এই যুক্তির উপর কোন ভাষার রাষ্ট্র-ভাষা হইবার দাবী নির্ভর করে না। বড় বড় জটিল আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের এবং স্বমতে আনার মতো শক্তি, গাম্ভীর্য ও মর্যাদা সেই ভাষার থাকা উচিত। সে ভাষা বিশ্বের বড় বড় স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষার মতো শক্তিশালী হওয়াও প্রয়োজন। উল্লিখিত ঐ সকল যোগ্যতা একমাত্র বাঙলা ভাষারই আছে, ভারতের অন্য কোন ভাষার নাই, ইহা সহজ, সরল ও সত্য কথা।" সমিতির কাছে যাহা সহজ, সরল ও সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা কি সত্যই তেমন সহজ, সরল ও সত্য? যে গুণ আমার মাতৃভাষার আছে তাহা সগৌরবে স্বীকার করিব, কিন্তু কল্পিত গুণ তাহার উপর আরোপ করিলে প্রতিবাদ ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না। বিশ্বের বড় বড স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা অর্থাৎ ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষার সহিত বাঙলা ভাষার ঐশ্বর্যকে তুলনা করিলে পরিণতবয়স্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পাশে ক্ষুদ্র একটি শিশুর ছবি চোখে ভাসিয়া ওঠে। "বড় বড় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের এবং স্বমতে আনার মতো শক্তি, গাম্ভীর্য ও মর্যাদা" বাঙলা ভাষার আছে কি? সমিতি হয়তো রবীন্দ্রসাহিত্যের উল্লেখ করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান সম্পদ অন্তর্জীবনের বার্তা। পৃথিবীর কূটনৈতিক, আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ নয়। তাহা ছাড়া পৃথিবী যে রবীন্দ্রসাহিত্যে মুগ্ধ হইয়াছে সে তো ইংরাজি ভাষা বা ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমে। বাঙলা ভাষা এখন পর্যন্ত বন্দিনী রাজকন্যার মতো বাঙলা দেশেই সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করিতেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা এখনও বাকি। সমিতি হয়তো বলিতে চান যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা যে ভাষাতে আছে, তাহারই রাষ্ট্র-ভাষা হওয়া উচিত। তাহা যদি হয়, তবে তো বাঙলা ভাষার কিছুমাত্র আশা-ভরসা নাই। বাঙলা ভাষায় রাষ্ট্র পরিচালনা দূরে থাকুক একখানা স্মারকলিপি লিখিতেও ভরসা হয় না। রাষ্ট্র পরিচালনার যুক্তিকে গ্রহণ করিলে উর্দু ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সবচেয়ে অধিক। কারণ মোগল আমলে রাষ্ট্র পরিচালনার ভাষা ছিল ফার্সি। ফার্সির সেই শক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে উর্দু ভাষা কতক পরিমাণে পাইয়াছে। সমিতি নিশ্চয় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে রাজি হইবেন না, অতএব ঐ যুক্তিটা পরিত্যাগ করাই বুদ্ধির কাজ হইবে। বৃটিশ আমলের পূর্বে পর্যন্ত বাঙলা ছিল চণ্ডীমণ্ডপ, দলাদলি ও পল্লীজীবনের ভাষা, ইংরাজি শিক্ষার পরে হইয়া উঠিয়াছে আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের ভাষা। বহির্জীবনের বৃহৎ, জটিল সমস্যা সমাধানের গুণটিরই তাহার বিশেষ করিয়া অভাব। সমিতি সেটিই বিশেষ করিয়া বাঙলার হইয়া দাবী করিয়াছেন। কুযুক্তির তুফানে কোন্ ঘাটের নৌকাকে কোথায় লইয়া ফেলে!

সমিতির মতে বাঙলার রাষ্ট্রভাষা হইবার আর একটি যোগ্যতা নিম্নলিখিতরূপ। "বাঙলা ভাষাই ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্নিবাণী প্রচার করিয়াছে।" এ দাবী একেবারেই সত্য নহে। আধুনিক ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকগণ সিপাহী-বিদ্রোহকেই দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদিপর্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সিপাহীগণ যে ভাষাতেই অগ্নিবাণী প্রচার করুক, বাঙলা ভাষাতে নিশ্চয় করে নাই। বরঞ্চ সেকালে অগ্নিবাণীর বিপরীত বাণীই বাঙলা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের কুৎসার সাক্ষী ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। তৎকালীন বাঙালী রাজনীতিকগণ এই কথাটাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিদ্রোহটা সিপাহীদের একটা গোঁয়াতুর্মি, তাহার সহিত দেশের জনসাধারণের কোন

যোগ নাই। যাই হোক, এসব যুক্তি কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিতে পারে না। যে বিশেষ গুণে ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়, বাঙলা ভাষায় তাহার অভাবটাই প্রকট।

বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা নাই—এ সত্যটা আমার কাছে এতই স্পষ্ট যে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। সে উদ্দেশ্য এ প্রবন্ধের নহে। সমিতির স্মারকলিপিখানি পড়িয়া সম্পূর্ণ হতাশ হইয়াছি—এই রচনা সেই হতাশা প্রকাশের একটা উপলক্ষ্য। বঙ্গভাষা-প্রসার সমিতি চপল-বুদ্ধি ছাত্র-প্রতিষ্ঠান নয়, স্বার্থপ্রণোদিত রাজনৈতিক উপদল নয়, একটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। বহু গণ্যমান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাপন্ন মহাশয় ব্যক্তি ইহার সভ্য। তাঁহাদের কলম হইতে এমন সব যুক্তি কিভাবে বাহির হইল তাহাই ভাবিতেছি। বাঙলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হোক বা না হোক, কিন্তু এ উপলক্ষ্যে স্মারকলিপিতে যে মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। এই স্মারকলিপিকে বাঙলা দেশের সাধারণ মনোভাব বলিয়া গ্রহণ করিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিকটে বাঙলা দেশের গৌরব বাড়িবে না। বাঙলাভাষী একজন সামান্য বাঙালী হিসাবে একটা প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। প্রবন্ধটি অ-বাঙালী পাঠকের চোখে পড়ুক, এই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লই নাই, তাহাতেই হয়তো প্রমাণ হইবে যে, বাঙলা ভাষার প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নাই।

বাঁচিবার পথ

বাঙালীর দুরবস্থার কথা লিখিতে বসিয়াছি, ভাবিতেছি কোথা হইতে সুরু করিব? যে কোন স্থান হইতে সুরু করিলেই চলে, সর্বাঙ্গে ক্ষত। প্রথমে ভূগোল হইতেই আরম্ভ করা যাক্। বাঙলাদেশ তিন খণ্ড ও দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ বা পাকিস্থান, আর পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত-রাষ্ট্র। আবার বাঙলাদেশের কতকটা অংশ অনেক কাল হইল বিহারের অন্তর্গতরূপে আছে। এই গেল মোটামুটি তিন ভাগ। কিন্তু আরও ভাবী ভাগের আভাস বহন করিয়া দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা ত্রিশঙ্কুর মতো আকাশে ঝুলিয়া আছে। ইহাকে পার্বত্য বঙ্গ বলা যাইতে পারে। অল্পকাল মধ্যে ইহার বাঙলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার আশঙ্কা। কেন? বাঙালী ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী করিয়া বিহারের অন্তর্গত কতক অংশকে ফেরৎ চাহিতেছে। এই দাবীর মূলে মানভূম জেলার অধিকাংশ এবং পূর্নিয়া জেলার কতক অংশ বাঙলাদেশ ফেরৎ পাইতে পারে। কিন্তু ওই ভাষাগত দাবীমূলেই পার্বত্য বঙ্গ বাঙলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। ওই নীতিটা বাংলাদেশের অনুকূলে ক্রিয়া করিবে আর প্রতিকূলতার বেলায় নীরব থাকিবে এমন হইতেই পারে না। পার্বত্যবঙ্গের প্রধান ভাষা বাঙলা নহে। তবে দাঁড়াইবে এই যে, পশ্চিম বঙ্গ পশ্চিম দিকে যেটুকু অংশ পাইবে, তাহার চেয়ে বিস্তৃততর অংশ তাহার উত্তর সীমানা হইতে খসিয়া যাইবে, অধিকতর বিত্তশালী অংশও বটে। পার্বত্য বঙ্গে চা-এর চাষ। মানভূম জেলার কয়লা-খনির এলাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই—ফাঁকা ময়দানের অংশ পাওয়া যাইবে—স্বাস্থ্যকর সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যোচিত খাদ্যের ব্যবস্থা সেখানে কোথায়? কাজেই মনে হইতেছে, আজ বাঙলাদেশের যে ভৌগোলিক

বিভূতি আগামী কাল তাহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই—বরঞ্চ অবনতির আশঙ্কাই অধিক।

এই তো গেল ভৌগোলিক বিবরণ। এবারে ঐতিহাসিক অবস্থার আলোচনা করা যাইতে পারে। রাজনৈতিক ইতিহাসই ধরা যাক্। ১৯১৭ সালের পরে কংগ্রেস হইতে বাঙালীর প্রাধান্য লোপ পাইয়াছে। বাঙালী-সমাজ এই প্রাধান্য লোপের অপমানকে ভুলিতে পারে নাই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বাঙালী প্রধান ছিল, ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান তাহার করতলগত ছিল। ১৯১৭ সালের পরে তাহার প্রাধান্য গেল। বাঙালীর অভিমান আহত হইল, তাহার বালকসুলভ ক্রোধ ও অভিমান কংগ্রেস তথা কংগ্রেসের নূতন নায়কগণের উপর পড়িল, অকারণে কংগ্রেসকে দুয়ো দেওয়া এবং তুচ্ছ কারণে তাহার দোষ লইয়া মাতামাতি করা তাহার ব্যসনে পরিণত হইল। কিন্তু কেন যে বাঙালীর হাত হইতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব খসিয়া গেল সে বিষয়ে একবারও সে চিন্তা করিল না। ১৯১৭ সালের আগে অবধি কংগ্রেস ছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের প্রতিষ্ঠান, গান্ধীজির আবির্ভাবে তাহা ধীরে ধীরে হইয়া দাঁড়াইল জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। বাঙালী-নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে আবদ্ধ—তখনও ছিল, এখনও আছে। জনসাধারণের চর্চা বাঙালী সমাজ বা বাঙালী নেতা কখনও করে নাই, এখনও করিতেছে না,—কাজেই কংগ্রেস যেদিন জনসাধারণের ভিত্তির উপরে দাঁড়াইল, বাঙালীর নেতৃত্ব অতি স্বাভাবিক কারণেই লোপ পাইল। দোষ যদি কাহারো হয়, তবে তার নিজের। বাঙালী মনে করে দোষ অপরের। ক্ষীণ-দৃষ্টি নিজের দোষ দেখিতে পায় না, ক্ষীণ-স্বভাব নিজের দোষ স্বীকার করে না।

প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে, ওই সময় হইতেই, বিশেষ লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর হইতেই কংগ্রেস হইতে মহারাষ্ট্রের প্রাধান্যও লোপ পাইয়াছে। একই কারণে লোপ পাইয়াছে এবং একই প্রতিক্রিয়া মহারাষ্ট্রীয়ের মনে জাগাইয়াছে। সাধারণভাবে বলা অন্যায় হইবে না যে, মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশ

গান্ধী-কংগ্রেস-বিদ্বিষ্ট। এই দুই প্রদেশের চরিত্রে মিল আছে, দোষেও বটে গুণেও বটে। তার উপরে শিবাজীর আদর্শে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের নেশা মারাঠীর এখনও কাটে নাই। তাহারই সবনাশকর প্রতিক্রিয়া জানুয়ারী মাসের শেষে ঘটিয়া গিয়াছে।

রাজনৈতিক অবস্থার পরে অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। বাঙলাদেশের শস্যভাণ্ডার পূর্বোত্তর বঙ্গ—যে-অংশ এখন পররাষ্ট্রগত। পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম জেলাগুলির অধিকাংশ স্থানই অনুর্বর প্রান্তর। তার উপরে লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহার আয়তন অপ্রতুল ও অনুদার। পশ্চিমবঙ্গের ঐশ্বর্যের মধ্যে কলিকাতা শহর। কিন্তু কলিকাতার ঐশ্বর্যে বাঙালীর ভাগ কতটুকু? কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্যাপিটাল অবাঙালীর হাতে, আর লেবার বা শ্রম অবাঙালী; তবেই বাঙালীর হাতে থাকিল কেরাণীগিরি, দালালি আর ধর্মঘট পাকাইবার ভার। তাহাতে দলাদলি চলে, কিন্তু পেট চলে না।

দলাদলির কথাই যদি উঠিল, তবে না বলিয়া উপায় নাই যে, বাঙলার বর্তমান রাজনৈতিক দলাদলি পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। দলীয় স্বার্থের খাতিরে বাঙালী নেতাগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে অণুমাত্র কুণ্ঠাশীল নয়। আপনি মন্ত্রীর গদিতে বসিবার আশায় বাঙালী নেতা কী না করিতে পারে জানি না। মৃণালিনী উপন্যাসের পশুপতি চরিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র কাল্পনিক বলিয়াছেন—কিন্তু বাঙালী নেতাদের ব্যবহার দেখিয়া পশুপতিকে আর কল্পনা মনে হয় না। তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া দেশের লোক কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে; শুধু কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখার উপরে নয়, ভারতীয় মূল প্রতিষ্ঠানের উপরেও। বাঙালী কংগ্রেসী নেতাগণ নিজেদের ব্যবহারে বাঙলার মনকে অধিকতর কংগ্রেস-বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতেছে; ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, কংগ্রেস-আশ্রয়ী নেতাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ম্লান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু রহস্য এই যে, এদিকে মন দিবার সময় তাহাদের

নাই—নিজের ও নিজের দলের জন্য 'পারমিট' বাহির করিতেই সে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত। আরও একটি ফল এই যে, কংগ্রেসের যোগে ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতা শিথিল হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ বাঙলার বর্তমান কংগ্রেসী নেতাদের অপরিমিত লোভ এবং দুর্নীতির সমর্থনের ফলে তাহাদের নিজেদের এবং পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক ভিত্তি ক্রমশ ভাঙিয়া পড়িবার মুখে আসিতেছে। বাঙলাদেশ ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ হইতে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে—এই সর্বনাশের প্রধান দায়িত্ব বাঙলার বর্তমান কংগ্রেসনায়কগণের।

কত আর বলিব? আগেই বলিয়াছি সর্বাঙ্গে ক্ষত। বাঙালীর শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প যে-কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব—বাঙালী-সমাজ একটা সর্বাঙ্গীণ ভাঙনের মুখে চলিয়াছে। নৌকা ঝড়ের মুখে নোঙর ছিঁড়িয়াছে—এখন যদি বাঁচে তবে নিজের গুণে বাঁচিবে না, নিতান্তই অদৃষ্টগুণে মাত্র বাঁচিবে।

২

উনবিংশ শতক বাঙলাদেশের গৌরবের কাল। এই সময়ে বাঙালীর শিক্ষা, দীক্ষা, জাতিগত প্রতিভা তুঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। এমন গৌরবময় শতাব্দী বাঙালীর জীবনে আর একবার মাত্র আসিয়াছিল—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী শতাব্দীকাল বাঙালীর আর একটি আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির যুগ।

বাঙালীর উনবিংশ শতকের গৌরবের মূলে আছে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব, ইউরোপীয় জীবনদর্শনের প্রতিক্রিয়া। আর সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙলাদেশেই প্রথমে ব্যাপকভাবে ইংরাজ-শাসন ও ইংরাজী শিক্ষা

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙালী-সমাজ নূতন শিক্ষায় অগ্রণী হওয়ায় শিক্ষার ও রাজশাসনের বাস্তবফল আর-সকলের আগে পাইয়াছিল। কলিকাতার ব্যাবসায়িক সমৃদ্ধির মূলে আছে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ে বাঙালী ব্যবসায়িগণের সহযোগিতা। তৎকালীন বাঙালী ব্যবসায়িগণের অধিকাংশই ইংরাজ-কোম্পানীর বেনিয়ান, মুচ্ছুদ্দি প্রভৃতি রূপে প্রভূত ঐশ্বর্য অর্জন করিয়াছিলেন। আজকাল আমরা দুঃখ করি যে, কলিকাতার ব্যবসায় অবাঙালীর হাতে চলিয়া গেল—কিন্তু সেকালে কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ছিল বাঙালী। কতকটা কালের ধর্মে, কতকটা প্রতিযোগিতার চাপে বাঙালীর হাত হইতে ব্যবসায়ের মোটা সূত্রটা স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

আর সেকালে বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন—শিখিয়া ডাক্তার, মাষ্টার, উকীল প্রভৃতি হইয়াছিলেন—তাঁহাদের অনেকেই অনগ্রসর অন্যান্য প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সেই প্রদেশের অনেক স্থলেই বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—সেই সব প্রদেশের নানা-বিষয়ক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এইভাবে কাশ্মীর হইতে মহীশূর, এবং বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বাঙালীর, প্রবাসী বাঙালীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাকেই বলা যাইতে পারে প্রকৃত বৃহত্তর বাংলা।

ইংরাজ-শাসনের আর একটি কৃতিত্ব এই যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বাংলাদেশ একটি সুবৃহৎ, শক্তিশালী, শিক্ষাদীক্ষায় প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রধানত ডাক্তার, উকীল, শিক্ষক, অধ্যাপক ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিয়া লইয়া এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন সুবৃহৎ ও শক্তিশালী নয়। আর বাংলাদেশেও তৎপূর্বে ঠিক এই ধরণের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। বাঙালীর কালচার বলিতে এখন যাহা বুঝি—তাহার অধিকাংশই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের

সূত্রপাতও বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, ক্রমে তাহা অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের বিড়ম্বনায়, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজ-শাসনের ভিত্তি ছিল, সেই ভিত্তিই একদিন কাঁপিয়া উঠিয়া ইংরাজ শাসককে কাঁপাইয়া তুলিল। এসব কথা চিন্তা করিলে বাঙালী গৌরব করিতে পারে বই কি। কিন্তু সে গৌরব নিতান্তই অতীত গৌরব। আজকার বাঙালী সব দিক হইতেই নিঃস্ব।

এবার অন্য একটা বিষয়ের পূর্বালোচনা আবশ্যক। ইংলণ্ডের গৌরবের কাল হইতেছে ঊনবিংশ শতক। বর্তমান কলকব্জার যুগে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় যাত্রায় অগ্রবর্তী ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে বাঙলাদেশ হইতে যে প্রভূত অর্থ ইংলণ্ডে গিয়াছে, প্রধানত তাহাকেই মূলধন করিয়া ইংলণ্ড কলকারখানা গড়িয়া তুলিয়া তাহার পণ্যে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে তাহার পৃথিবীজোড়া বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িবার মুখে। বৃটেনের সাহায্যে বাঙলাদেশ সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আবার বাঙলাদেশ-লুণ্ঠিত অর্থে বৃটেন সর্বদেশীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পরস্পর না জানিয়া পরস্পরের সহায় ছিল। আজ দেখা যাইতেছে বৃটেন ও বাঙলাদেশ দুইয়েরই সমান অবস্থা—দুই দেশেরই সমৃদ্ধির প্রবাহ আজ অবনতির মুখে। আবার বাঙলাদেশ যেমন ভারতের বহুস্থানে প্রবাসী সমাজ স্থাপন করিয়াছিল, বৃটেনও তেমনি পৃথিবীর বহুস্থানে প্রবাসী ইংরেজ সমাজ স্থাপন করিয়াছে। নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রবাসী ইংরেজ-সমাজ। এগুলিকে বৃহত্তর ইংলণ্ড বলা উচিত। বর্তমানে ভারতসাম্রাজ্য ও ব্রহ্মদেশ ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিয়াছে, আজ হোক আর কাল হোক তাহাকে বিভক্ত বা অবিভক্ত মিশর নিশ্চয় ত্যাগ করিতে হইবে। এত ক্ষতি সত্ত্বেও ইংলণ্ড তাহার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কিছুই নয়, একমাত্র প্রবাসী ইংরাজ-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিয়াই

ইংলণ্ড তাহার পূর্বগৌরব রক্ষা করিতে পারে—সেই পন্থাই সে অবলম্বন করিয়াছে। তাহার সম্মুখে অন্য পন্থা নাই। বৃটেন ও বাঙলাদেশের উন্নতি ও অবনতি অনেক পরিমাণে সমসূত্রে জড়িত। উদাহরণ দুইটির মধ্যে আয়তন ও আকৃতির প্রভেদ থাকিলেও, গুণগত প্রভেদ বিশেষ নাই। বাঙলাদেশ যেমন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রগতির ফলে কোণঠাসা হইতে চলিযাছে—বৃটেনের আজ সেই অবস্থা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ—ইতিহাসের যাত্র যাহারা পরবর্তীকালে আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা আজ বৃটেনকে পশ্চাতে ফেলিতে সুরু করিয়াছে। কেবলমাত্র খেদ করিলে তাহাদের প্রতিকার হইবে না—পূর্ব প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার বা নূতন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। বৃটেনের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সেই উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত। বাঙলাদেশকেও উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে। হায় হায় করিয়া মরা, অন্যের উপরে দোষারোপ করা বা পৃথিবীর সমস্ত দেশের উপরে নিজের ব্যর্থতার দায় চাপাইয়া দেওয়া—এসবে কোন ফলোদয় হইবে না। ইতিহাসের বিধাতা কাজ চান—কথায়, বৃথা কথায় তাঁহার রুচি নাই। বাঙালী-সমাজ এখনো সার্থক কর্মের পথে না নামিয়া কেবলই কথায় বাজিমাৎ করিবার চেষ্টায় আছে। নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে, বাঙালাদেশের নেতৃস্থানীয়গণও এখন পর্যন্ত এই সহজ সত্যটা বুঝিতে পারেন নাই। জাতিকে চালিত করিবে কে? বাঁচিতে চাহিলে জাতিকে নিজেই চলিতে হইবে এবং ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছে নেতৃহীন হইয়াই চলিতে হইবে। তাহা [illegible]লাম, কিন্তু বাঁচিবার নূতন পন্থাটা কি?

৩

বাঙালীকে মরিলে চলিবে না, বাঁচিতে হইবে। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে, তাহার উনবিংশ শতকের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখাও আর সম্ভব

হইবে না। বৃটেন বুঝিয়াছে যে, তাহার পক্ষে পৃথিবীর উপরে ছড়ি ঘুরাইয়া কর্তৃত্ব করা আর সম্ভব নয়, এখন তাহাকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগিতার সূত্রে বাঁচিতে হইবে। বাঙলাদেশকেও এখন নিজের ক্ষেত্রে এই সত্যটাই উপলব্ধি করিতে হইবে। বাঙলাদেশের পক্ষেও এখন পূর্বগৌরবের জের পরিত্যাগ করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহযোগিতার চর্চা করা আবশ্যক। সে সময়ের বাঙালী ভাবিয়াছে, আমিই ভারতবর্ষ,—এখন তাহাকে ভাবিতে হইবে যে, আমরাই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহযোগিতা ও সহানুভূতি অর্জন করিতে না পারিলে, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিলে, বাঙলাদেশকে ক্রমেই কোণঠাসা হইতে হইবে। 'স্বাধীন বাঙলা,' 'বৃহত্তর বাঙলা'-জাতীয় প্রতিক্রিয়ামূলক আইডিয়া যুগোচিত বস্তু নয়, এগুলি ভারতবর্ষের সংহতির অন্তরায়। এই শ্রেণীর ভাব মস্তিষ্ক হইতে এককালে বিদায় করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বৃহত্তরত্ব ও স্বাধীনতার নামে ইহা প্রাদেশিকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রাদেশিকতা বর্জন না করিতে পারিলে বর্তমান কালে টিঁকিয়া থাকা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে সমস্ত দেশই অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিয়া বলশালী হইতে চেষ্টা করিতেছে—আর বাঙলাদেশ যদি ঠিক তাহার উল্টাপথ ধরে, সকলকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইতে চায়, তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। এ বুদ্ধি মৃত্যুর বুদ্ধি।

বিহারের অন্তর্গত বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চল যদি বাঙলাদেশে সমগ্রভাবে বা আংশিক ফিরিয়া আসে তবে ভালই, কিন্তু না আসিলেই যে বাঙলাদেশের পক্ষে মহা অমঙ্গলের ব্যাপার এমন মনে করি না। প্রাদেশিক সত্তার উপরে ভিত্তি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার দিন গত হইয়াছে; এখন একটি মাত্র সত্তা আছে—ভারতরাষ্ট্রীর সত্তা। যতদিন মানভূম প্রভৃতি অঞ্চল ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত আছে, ততদিন সে সব বাঙলাদেশের পক্ষেই আছে মনে করিতে হইবে।

অবশ্য এই নূতন প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি বাঙলাদেশের পক্ষে একচেটিয়া নহে,

সমস্ত প্রদেশকেই অল্পবিস্তর এই ভূতে পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু বাঙালী বলিয়া বাঙলাদেশকেই সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার আমার আছে।

সমস্ত প্রদেশের প্রাদেশিক সত্তা যদি আজ গা-ঝাড়া দিয়া মন্ত্রবেগে বাহির হয়, তবে ভারতরাষ্ট্র আপনি ভাঙিয়া পড়িবে। আর ইতিহাসের শিক্ষা হইতে বারে বারে দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় সংহতি নষ্ট হইবামাত্র দেশ দুর্বল হইয়া পড়িয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি কোন কাজে না লাগে, নবলব্ধ স্বাধীনতা যদি বিনষ্ট হয়, তবে দুর্ভাগ্য কাহার? উনবিংশ শতকে বাঙলাদেশের মনীষিগণ ভারত-চৈতন্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন—ভারতরাষ্ট্র-চেতনার ইঙ্গিত কি বাঙলাদেশ আজ দিতে পারিবে না? বাঙলাদেশের মনীষা যদি আজ সেই পথে চালিত হয়, তবে সে নিজে বাঁচিবে, ভারতরাষ্ট্রকে বাঁচিতে সাহায্য করিবে আর তাহার পূর্বগৌরব কতক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। ইহাই বাঁচিবার যুগোচিত পন্থা। প্রাদেশিকতার পথ বিনাশের পথ—এ পথ পরিত্যাগ না করিতে পারিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ভারতরাষ্ট্র বাঁচিয়া থাকিলে সকলেই বাঁচিবে। ভারতরাষ্ট্রের সংহতি নষ্ট হইলে কোন্ প্রদেশ বাঁচিবে? এই সত্যটাই এখন আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে।